ষষ্ঠ প্রকাশ, ২৫ বৈশাখ, ১৪১৭, ৯ মে, ২০১০

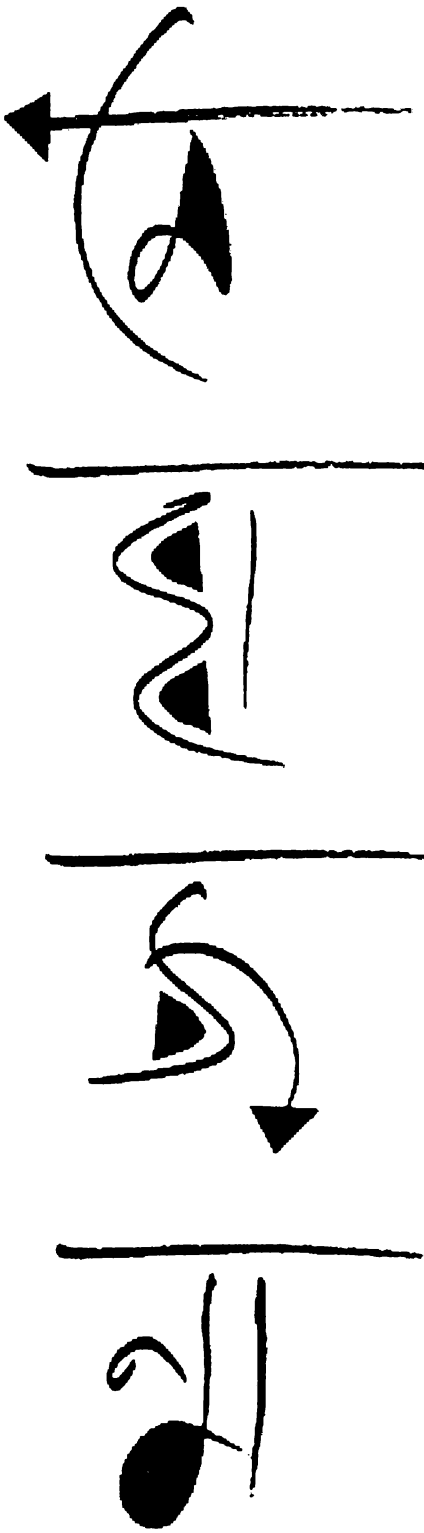

দে ও য়া ল লি খ ন

এতদিন সবাই যেন বিছানায় শুয়ে ল্যাদ খাচ্ছিল। অতঃপর এক নগ্ন বিপর্যয়। বোমাটি যিনি ফাটালেন তিনি এক তরুণ প্রকাশক। বলা নেই কওয়া নেই দুম করে দশজন তরুণ কবির প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেছেন এবারের বইমেলায়। সেই থেকে নিরবধি এক চলমান হইহই সহ্য করতে হচ্ছে। এই চিলচিৎকারের যুগোপযোগী নাম- শূন্যদশক। এই শূন্যদশকের দশজন পরিচিত, স্বল্প পরিচিত এবং অপরিচিত কবিরা কী উপায়ে প্রকাশকের কাছাকাছি এসেছেন এবং নিজেদের বই প্রকাশ করতে প্রকাশককে বাধ্য করেছেন সেই নিয়ে বিস্তর আজগুবি এবং হাস্যকর জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। গোপনে তদন্ত কমিশন তৈরী হওয়াটাও আশ্চর্যের নয়। তবে আসল কারণটা যাই হোক এই ঘটনায় এই দারুণ বৈশাখেও ধুন্ধুমার ঝড় চলছে। দিকে দিকে সংকলন প্রকাশের উৎসব শুরু হয়েছে। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই শূন্যদশক অবিকল একই রয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের পদতলে উবু হয়ে বসছে না, বড়রা অন্যায় কটুক্তি করলে মুখে মুখে তর্ক করছে। আর ক্রমশ একা হতে শিখে যাওয়া এই মহার্ঘ্য সময় নিজেকেই লিখে রাখছে শব্দের নিঃশব্দ আঁচড়ে, শূন্য শূন্য রাশি রাশি কবিতায়...

এই সংখ্যায় যাঁরা...

শূন্যের কবিতা : অনিমিখ পাত্র, অনির্বাণ কর, অভিষেক মুখোপাধ্যায়, অরিত্র সান্যাল, অরিন্দম রায়, অর্ণব রায়, ইনা রায়, ঋতম সেন, ঐত্রেয়ী সরকার, দীপান্বিতা সরকার, দেবব্রত কর বিশ্বাস, দেবর্ষি সরকার, পলাশ দে, পিয়াল ভট্টাচার্য, রাজদীপ রায়, শৈবাল সরকার, শ্রেয়সী চৌধুরী, সঙ্ঘমিত্রা হালদার, সোমব্রত সরকার, সৌপ্তিক চক্রবর্তী, হিমালয় জানা।

বিশেষ গদ্য : বিশ্বদীপ দে, মন্দাক্রান্তা সেন, সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা : বিশ্বদীপ দে, দেবব্রত কর বিশ্বাস।

সহায়তা রঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবিকা দে, অরিত্র সান্যাল, বিশ্বব্রত আচার্য্য।

নামাঙ্কন রাজীব চক্রবর্তী।

অলঙ্করণ দেবর্ষি সরকার

দাম ৫ টাকা

আসা

সামান্য রোদের আশা ঘুরিয়ে মেরেছে

তোমাকে পাবার মতো ঘর আমি
চোরাগোপ্তা প্রস্তুত করেছি

শীতকাল মুড়ে গ্যাছে বরফের স্নেহে

মনে হয়, ছোটো এক ছোটার সাধনা
আমাদের করে তুলবে
আগামী আসা'র চেয়ে প্রতিশ্রুতিময়

হারেম

কথায় কথায় মৃত্যু বুনে দিয়ে গ্যাছো
কোথায় কোথায় মৃত্যু সেজে উঠছিল
এ প্রশ্নে হারেম ভেঙে
মগ্ন মুহূর্তগুলি উড়ে উড়ে গ্যালো

দৃশ্যের হাড় থেকে
তীবতার ফুটে ওঠা শিরা ও জালিকা থেকে
উঠে আসছে গান
তাকে তো আমিই জীবনে এনেছি

এই সমস্ত দেহশিল্প
অণু পরমাণু। তার আধারগরিমা

কথায় কথায় মৃত্যু হেসে উঠেছিল
তার সুশ্রীতা ও শীৎকার প্রিয় কি ছিল না?

সিকিম

শীতের পাহাড়ে এসে বুঝেছি সহজ এক ছকের ভ্রূকুটি
দেখি মেঘডালিমের ফুটে ওঠা
শব্দের অহংবোধ, পরীক্ষিত ডানা
যে কোনো হেয়ার পিন বাঁকে
প্রশ্নের বিষমবাহু খাদ থেকে পড়ে যেতে থাকে

পুরনো বান্ধবীকে...

ক।

ভোররাতে ঘুমঘোরে যেসব স্বপ্নেরা ফিরে আসে
তাদের বুকের মধ্যে খুঁজি আমারই ক্ষতের দাগ
মুছে গেছে বহুকাল, আজ শুধু ব্যথা থেকে গেছে
তাদের দুহাতে টানি, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে তুলে নিই
ব্যথার কোলাজ থেকে বেছে বেছে সুগন্ধী পালক
'একসঙ্গে একরাত...' কথা ছিল বাইরে কোথাও
টাওয়ারহীনতা আর অন্ধকার শহরের থেকে

তোমাকে সেসব কথা কীভাবে জানাব শুধু ভাবি...

খ।

কে কাকে মার্জনা করে বোলো? এত পাপবোধ বুকের ভেতর
খোলসের ভেতর থেকে উঠে আসা বহুকাল লুকোনো শীৎকার
কী করে লুকাবো আজ মায়াময় রোদলাগা শীতের দুপুরে
আর কোনো ছায়া নেই, কবিতার বই আর বালিশের পাশ
এসব ফুরিয়ে যায়, আমাদেরও হাত ধরে অচেনা বাহক
পৌঁছে দেয় অন্ধকার, ছায়া ছায়া, মাটি মাটি প্রাচীন গুহায়

মার্জনা করবো কাকে, এত এত পাপবোধ... আমিও তো জানি
এইসব পরিণতি ভিনদেশে এসে পড়া নাবিকের হয়...

গ।

যেকোনো বিচ্ছেদ জানি শাস্ত্রমতে এরকমই... সহজ, সরল
উপদ্রুত অঞ্চলের কাছাকাছি তাই ক্যারাভান নিয়ে এলে
উদ্বাস্তু জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল অসুখের ছায়া
সে সব দিন, মুহূর্ত, হাসপাতাল ভরে থাকা সমস্ত যন্ত্রণা
স্যালাইন বোতলের পুতিগন্ধ মুছে দিতে দিতে তুমি তাই
পরপর তিনরাত্রি জেগে দেখবে কখন হাত ছেড়ে গেছে
সমুদ্র জলের মত কালো টিপ, বেহিসেবি, জানতে পারনি
ছায়ার দুপাশে থাকা চিঠি, ফোন, আর প্রিয় মানুষের মুখ

সমস্ত বিচ্ছেদ দেখো, শাস্ত্রমতে এরকমই, সহজ, সরল
ক্যারাভান জুড়ে শুধু ভেসে থাকে আরও এক রাক্ষসীর বুক...

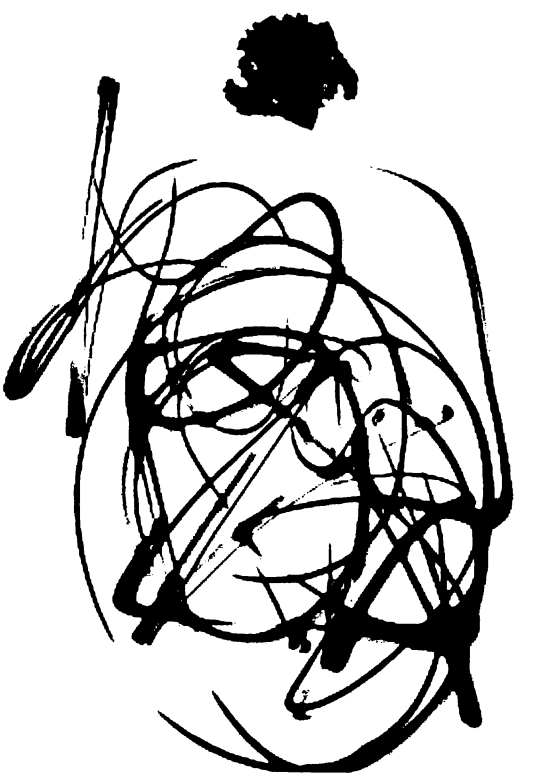

অ ভি ষে ক মু খো পা ধ্যা য়

তিনটি কবিতা

১.
অথচ সাবমেরিনের মধ্যেই বিভোর থাকত কলোনিয়াল ট্রামআলপথ

ফুটপাত থেকে যখন ভেলকিদয় হয়, নেমে আসে বরফ লেপের কপাট, হয়তো বেতারপ্রহরের চেয়ারে স্পর্শকাতর ট্রাম্পেট এখনো বেজে চলেছে ...

আজকাল অনেকেই আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে ভালোবাসে।

২.
জিন্স গন্ধের চলন ভেসে আসে
পালিত ঘুড়িতে
ককটেল ইশারায়,
পাললিক কুয়াশা গোটা ইস্কুলঘর ঘিরে আছে
পিটপিট নিশানার আনাচে কানাচে রাশিফলের ভোর,
হে, ঘুমপাড়ানি সিডিতট, আধপোড়া কার্নিশ
এঁকে চলো ল্যাণ্ডস্কেপে চড়াইনাম;
ফিলামেন্ট রোমাঞ্চে সিঁড়ি বদলে যাচ্ছে।
সকলে ভুলে যেতে চাইছে আস্তাবল।
আমার সেই সাহস নেই,
তোমার বাড়ি যেতে যেতে
মনে পড়ে যায়
অমনোযোগী দেহাতিবেলার টেবিল।

ছেলেবেলার নীল জামা দুটোয়
পরকীয়া সাইকেল আশকারা, তবু
মাঝে মাঝে জেনে ফেলে, ঢং ঢং খামার
শীতখোলা, শীতখেলা পরোয়ানা

৩.
খুলে গেছে শিকায়ৎ;
ফজরপথের ওপর দিয়ে সিগন্যাল ছড়িয়ে
জেগে আছে
প্যারাফিনিয় পদ্মপাতা
শিকারামেয়েদের দূরভাষ ঘামবাতাসের ঝরাপাতায়,
পাদ্রিঘোরের মোড়াই-এ

আজকাল উষ্ণতা থেকে কোন কোন লোক নীরবতায় এসে দাঁড়ায়

না বলা শীতকাল; ফেরিওলাদেহে টানটান আপেলনিবিড় দুরুহ...
নির্জন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে

নির্জন মানুষেরা আর সুড়ঙ্গ
আর দু'তিন পা-পাতা হাঁটা

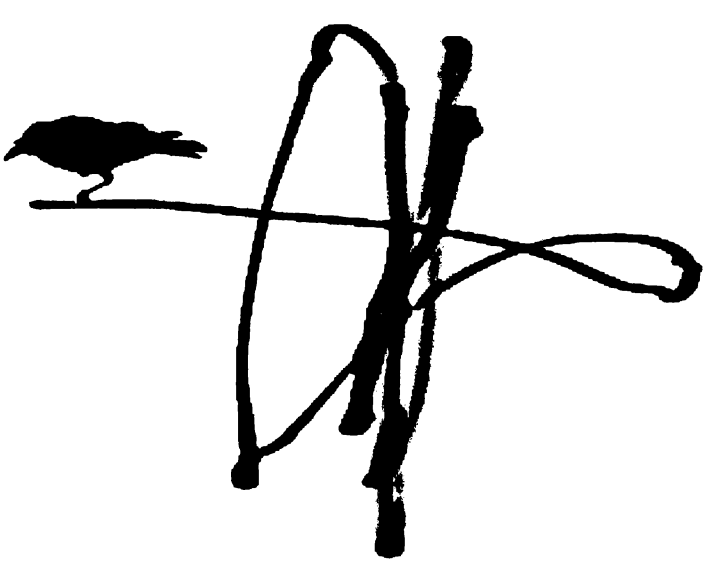

মায়া

আজকাল আমি যা-ই খুঁজি
তা-ই একে একে সব লুপ্ত ঘরোয়া আসবাব।
কোথাও লেখাটা শেষ এইখানে।
বাড়ির উল্টোদিকে গুপ্ত দরজা আছে।
লতাপাতা গুল্মের গম্ভীরা ঘেরা চোরা পথ
এতদূর সন্ধানে 'থাকো' 'থাকো' বলে কেউ
কোথাও কোথাও — সব-ই উল্টোদিকে,
উল্টো সরঞ্জাম, বিভিন্ন তলদেশ—
উঠে এলে ভালো লাগে
পুনরায় ব্যবহারে বোঝা যায়
কোথাও লেখাটা শেষ এইখানে
এরকম একদিনে তোমার মায়ার তল দেখে ফেলি...

সেগুন

যে জানলার কাঠামোয় লেগে আছে
ঈশানীর অন্যমন, তা আর
পুরোপুরি আয়তাকার থাকলো না।
কীভাবে কে উদাস হয়
একদিন না একদিন তার ভিতর খুঁজে পায় ঘুণ
রঙের মস্তাজ, কাঠের গুণে
ধরা আছে এই দুপুর
এই সাদাকালো

এখন একটু কান্না ধরে এলো
এখন একটু বেরিয়ে আসা যায়

আমাকে, মেয়েটা

মেয়েটা ভুলে যাবে একটু আগেই সে কেন হাসছিলো
কী সুর কী সুর ভাবতে ভাবতে যে পাতা বুজে আসছে
তাতে ফুটে উঠলো কাজলের প্রলেপ
একটা ছোট্ট ফড়িং এই দৃষ্টি বরাবর...
ধরা যাক, সেখান থেকেই বিকেল
এই পড়ন্ত রোদকে উদ্যান বলে কেউ কেউ
ঝাঁপিয়ে পড়ে,
কিন্তু তার আগে ততটা
উঁচু অব্দি কল্পনাও তো করতে হয়...
ঘড়িতে এখন বয়স কাঁটায় কাঁটায় থমকে আছে
আপাততঃ খেলাধুলো।
খেলাধুলো শেষে
আমাকে মেয়েটা ভুলে যেতে শুরু করবে।

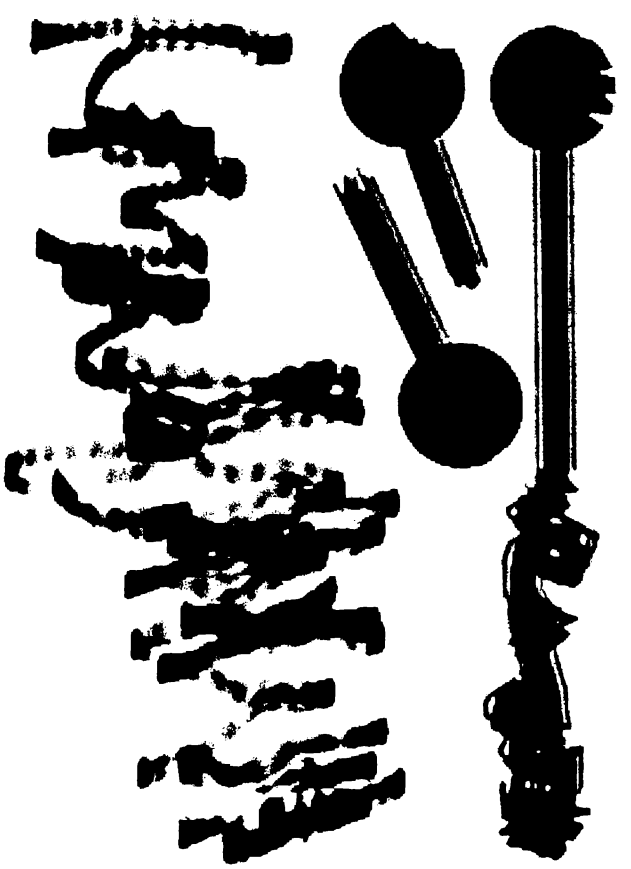

অ রি ন্দ ম রা য়

পথ

যে পথ তোমার নয় সেও কিন্তু দিয়েছে সংগ্রহ।
কুড়িয়ে নেওয়ার মোহ, দুহাতের রেখা মুছে যায়
অ্যাতো যে আনন্দ তার তিলমাত্র আমি কি পাবো না?

এসো ফের আগুনের মাঝখানে বসি
লোপ পাক সমস্ত শরীর
লবণ ও ভস্মমাখা যেটুকু জীবন

আজ তাকে খুঁজে বের করি।

অধিকার

তোমার বুকে, তোমার পিঠে
আমার চাবুকের দাগ

আবার আমিই দিই
শান্ত আদর
তুমি সব ক্ষতমুখ
মেলে ধরো—
যেন সুযোগ পেলেই উড়ে যাবে!

আমি পাখিবিক্রেতা কোন
তোমাকে দিই শান্ত আদর
তোমাকে দিই চাবুকের আদর

স্যানেটোরিয়াম

একসঙ্গে থাকি না আর

এই পাগল রোদ
চামড়া সেঁকতে সেঁকতে
আমি খরখরে পাঁউরুটি
উপহার দিচ্ছি তোমায়।

কী ভীষণ ধারালো এই বিছানার চাদর

নতুন দম্পতি, দেখো!

ফালাফালা হয়ে যাবে
সমস্ত অসুখ

অর্ণব রায়

অনন্ত

(১)
মহাকাল কেন বলছ? বাবলা গাছ,
একটা বাবলা গাছের মহৎ ছায়ার আওতায় বসে
মৃত্যু হচ্ছে,
ফুল ধরাবার সময় এলে
আপনি গুটিয়ে নেবে সব অন্যমনস্ক হুল—

(২)
সমকাল বলে যে বিশাল ঝলমলে তাঁবু পড়েছে,
থরে থরে আলো
টানা দেওয়া মাস্তুল
আর ছিলা উঠিয়ে ভোজ...
সবাই এলিয়ে গেলে,
একে ঘুরে ঘুরে চাপা গলায়
চা চাই কফি চাই ডেকে বেড়াচ্ছি

(৩)
কাঠ যে মজেছে
তার করুণ দেহপত্র ধরে মরমী ডেঁয়ো পিঁপড়ে
ওঠানামা করে,
কামড়ায়, তার ভালটুকু ঢালে

মাটির মদিরা ওঠে হাতে
চুল চুড়ো হয়
দেহপত্র ঢাকে সোনার ছাইয়ে

দিনমানের জন্য গড়িয়ে বেড়িয়ে আসে

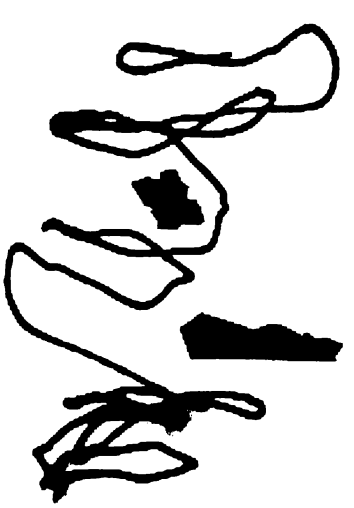

ইদানীং বাবা

বাবার ইদানীং ভয় হয়েছে
আমরা তাকে কোথাও একটা রেখে
চলে আসতে পারি,

আজকাল বড় বেশী আগ বাড়িয়ে
সব কাজ হাতে হাতে করতে যান,
বিশেষত খাটুনির,
এটা ওটা ছুতোয় আমাদের ঘরে
কান পাতেন,
না পারলে
ঘেয়ো চোখে আমাদের
নড়াচড়া দেখেন
হরিদেব কাকা গঙ্গাসাগর যাবেন মকড়স্নানে
বাবাকে বললে, আঁতকে উঠে কাঠফড়িং-এর মত
ঠক, স্থির হয়ে গেল,
আগে যদিবা সন্ধেতে আড্ডা-টাড্ডা মারতে যেত
এখন মুলে বাইরে বেরোতে চায় না
সারাক্ষণ কাঁপে—

যৌবনে মরে এত বছর পরে বাবা
ঠকঠকে তাঁবেদার এক বৃদ্ধ

গায়ে হলুদ

আমার দেহবর্ণের মত মোহময়
বা তাকানোর মত মারাত্মক
তুমি নও,
তাই
তোমাকে ভালবাসা,
বাথরুমে উলঙ্গ
সত্যি বলতে কি,
তোমার থেকে
নিজেকে দেখতে ভালো লাগে।

চারদিকে বিবাহের আবহ
হলুদ তেল মঙ্গলজল
এসবের মধ্যে
যখনই আসো
আমার চেয়ে নীচে
আমার চেয়ে কম

ই না রা য়

বিস্ময়

আকাশের রঙ নীলাভ করেছে কে?
কে লেখে শব্দ বৃষ্টির অক্ষরে?
কার হাতে মেঘ বর্ণমালার মত
ধূসর আবেশে সেজে ওঠে স্তরে স্তরে?

সাত রঙ ঢেলে কে সাজায় রামধনু?
কোন্ ইশারায় ছুটছে পাখির দল?
কীসের যত্নে পদ্মপাতায় খেলে
মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু জল?

কোন্ জাগতিক নিয়মের পথ ধরে
গ্রহরা ভাসছে মহাশূন্যের গায়?
কীসের খেয়ালে সূর্য ছড়ায় আলো?
কার খোঁজে চাঁদ রোজ উঁকি দিয়ে যায়?

কার টানে নদী আনন্দে উচ্ছল?
কার অনুরোধে কুঁড়ি ফোটে? ফুল হয়!
যা কিছু রয়েছে, অথবা যা কিছু নেই
এই জগতের সবেতেই বিস্ময়।

উষা

আকাশ জুড়ে আলোয় মাতে নীল
মাতন লাগে পাখির কলরবে
গভীর থেকে বার্তা উঠে আসে
পূবের কোলে জনম... ভোর হবে

বিধাতা লেখে জন্ম-ইতিহাস
গোপন ব্যথা নিবিড় ছোঁয়া পায়
প্রতিটা রাত বিষাদ ঢেলে দিয়ে
নীলের বুকে ভোরকে রেখে যায়

আঁধার নিয়ে নম্র পায়ে এসে
নিরীহ রাত বিদায় বলে যায়
ভোরের হাতে দিনের চাবিকাঠি
রাতের চোখে স্বপ্ন অসহায়...

পদরেখা

বাস থেকে নামা পায়ে পায়ে দ্রুতগতি
উড়ে এল কথা, 'চল্‌লাম'... কানে কানে
পথ বুঝেছিল অভিমান কাকে বলে,
একাকী দৃষ্টি সে-পায়ের সন্ধানে

ধীরে ধীরে পথে মিশে গেল চেনা চলা
দুচোখে প্লাবন... মিথ্যে ফেরার আশা

কিছুই ফেরেনা... ব্যবধান বেড়ে যায়
ধুলোয় ধুলোয় একাকার ভালোবাসা

তীব্রগতিতে ছুটে চলে সাঁঝবেলা
বাতাসে তখনো লেগে থাকে চেনা স্বর...
স্মৃতির আঙিনা জুড়ে থাকা পদরেখা
জীবাশ্ম হয়ে রয়ে যায় বরাবর...

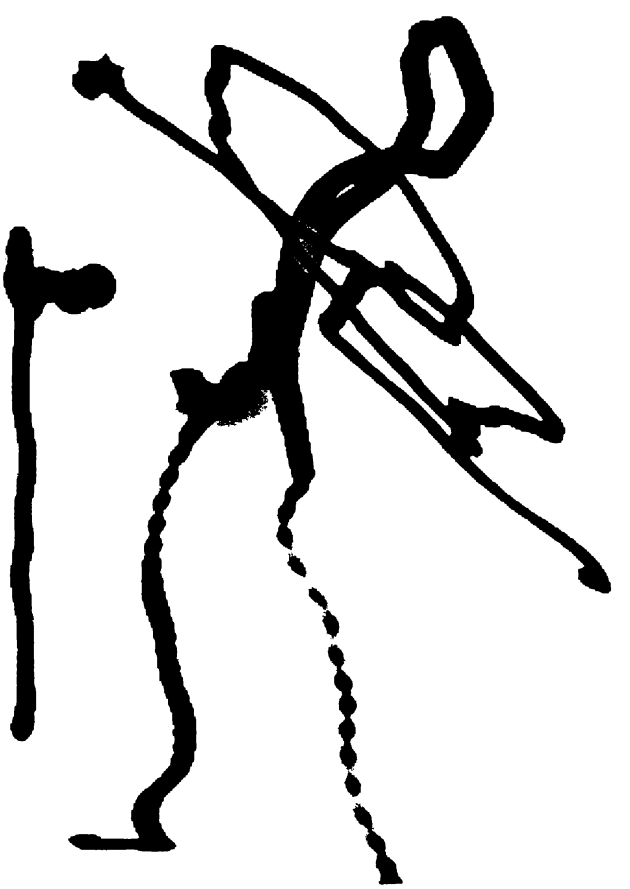

ঋতম সেন

দোল

'চুলের তেল' এর রক্ত
বন্ধ হয়ে এলো।
ঘুম এসো ঘুম
তাহার নক্ষত্র খুলে রাখি।
মনে রাখি বহু ব্যবহারে,
পাহাড়ে যাবার নামে তার ঘাস তাড়াতাড়ি বাড়ে

আঁধি

চাদরের ছেঁড়া দিয়ে রক্তমাংস উঠে আসে,
এমন বিকেল।
আহ্ প্যাপিরাস উড়ে যায়।
আয়নাদিগন্ত জুড়ে তার
মৃতঘোড়াদের ক্ষুরে ধুলোগন্ধ ক্ষতের বিস্তার।।

সিম্ফনি ঋতু

ওলোট পালোটে তার পপিচিহ্ন ঢেকে ঢেকে গ্যাছে।
এখন ব্যথার ঘোরে সাজ সাজ তাহার মোহর।
নেভানো রোদের তাতে
আপেলগ্রন্থির ঘুম ভাঙে,
তখন চামচে—
ঠুং ঠুং ঠুংরি আবহ।।

ঐ ত্রে য়ী স র কা র

গালিব-কে না লেখা চিঠি—এক

কবি মানে মৃতজীবী, অসহায় মাদারিকা খেল্
যেভাবে নাচাও নাচে, সহসা সালাম করতালি
জবুথবু দুটি হাত ঐ গোনে বে-হিসেবি আশ্‌রফি

কবির প্রকৃত নাম,
তাহলে কি শুধু
বিস্মৃতি!

গালিব-কে না লেখা চিঠি—দুই

যতটা বেকুব ভাবো ততোটা সহজ নয় আলো
জুয়াড়ীর খালি হাত — কবুতর ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
'মৃত নগরীর রাজা', বে-আদব মুশায়েরা নদী
কোথায় হারিয়ে গেলো শব্দের চেনা সম্মতি?

গালিব-কে না লেখা চিঠি —তিন

সন্ধ্যা নেমে এল, বাইরে কত শব্দ — টাঙার হাঁকডাক
পতঙ্গবাজী সেরে ফিরে আসা ছেলের দল আতরদানের
মৌতাত-মীরের গজল শুনে মশরুফ বুলন্দ ফাটক।

শাকি ও শরাব নিয়ে চৌসর পড়ে তবু একা।

'দিওয়ান-এ গালিব' হাতে ও পথে দেখেছি আমি
প্রতিটি তারার গায়ে জনৈক আমাদের, নাম লিখে রাখা।

দী পা ন্বি তা স র কা র

গোধূলি

জাফরিকাটা বিকেলের অল্প দূরেই যে বসতি
তাহার কিছু পরে
টিমটিম বাতিদের পাঠ শুরু হবে
আর কিশোরীরা ঘন করে জাল দিতে বসবে কাঁচা দুধ
এলোমেলো, খুব এলোমেলো ভাবে
ঝড় আসার খানিক আগেই
কবরখানার ওপর শুকোতে দেওয়া
সারিসারি কাপড় জামা
তুলে নিয়ে ফিরবে কোনও বিগতযৌবনা
যার আলতো সিঁথিপথে
এক বিষণ্ণ উলুধ্বনি থেমে আছে
থেমেই আছে ...

মৃত্যুকাল আগে যা বুঝেছি

বাদামী ছোঁয়াচ ভেঙে
কোন দূর শহরের ফুটপাথে

আমি তার পথ চেয়ে
কয়েকটি দোপাটি চারা উপড়ে ফেলি
হাওয়া জড়ো হয় ছাদের পুবদিকে

কেউ কেউ কেঁদে ফেলে।

নীল শিরা বরাবর রাত এলে
কিছু প্যারালাল ঘুম ছুটে মরে
পাড়ায় ও বেপাড়ায়
ওদেরও ঝিম আসে, নিমগন্ধে
শেষরাতে মরে যাবো, তাও
মুগ্ধতা, কেন বান্ধবীর আঙুল
বোঝালে আমায়?

বর্ম

হাওয়ায় ঘুম, ঘুমে ডুবে থাকা জন্মদাগ। যখন বুড়োটে আঙুল তার সহস্র চাঁদের মাখামাখি সেরে নুয়ে পড়ে চুলে চুলের পালকে আর উড়ে যায় একা, তখনও যুবতী ভুল খিলখিল তার আশেপাশে। ক্ষয়াটে আঙুল, যদি এই মর্মে সই কর যদি, তবে ভালো, তবে নদী হয়ে যাই ছলছল গ্রামের দুপুর বেয়ে কলসীতে কলসীতে লীলাময়ী সন্ধে হয়ে নামি, তুমি ধানের গোলার আড়ালে লুকোনো মৌমাছি, এসো, ধান ভানতে তোমার সাথে গান হল ভালো, ভালো মেঘ, ভালো তৃষ্ণার পোড়া ছাই, গহীন হাওয়ার পারে বসে ইচ্ছে বাঁশি তুমি বাজো, বেজে বেজে জলশৌচ সেরে ঘরে ফেরো। সীমের বীজের দুলে এই পোড়ামাটি দেহসাজ উড়ে গিয়ে অতঃপর সংক্রমণ! এই খণ্ড মধুভাণ্ড ছেনে-ছুঁয়ে ক'মাস চলে গো হরিহর? আমি তবে পুড়ে পুড়ে সোনার বর্ম হয়ে ঘুরি?

দেবব্রত কর বিশ্বাস

অগ্নিকাণ্ড

আমাকে রান্না করো টুকাই। ঘাড় ধরে উনুনে বসাও।
উৎসবে উৎসবে তেল ঝাল মশলা ফুটুক।

তারপর যদি কোনো ইন্দ্রিয়বোধ জাগে
মৃত মাদুর ভেবে পশ্চিমীঝঞ্ঝার দিকে ঠেলে দিও।

আমাকে অন্নরোগ জেনে কেউ কেউ জেলুসিল খেলো।
কেউ-বা বুঝে নিলো, আকাশে নক্ষত্রের মুখ
কালপুরুষের মতো...

এস এম এস

উহুঁ। আর কোনো কথা পাঠাবো না তোকে। এই
বিদুষী ত্রিশূলের চূড়ান্তে এসে অনুবাদ সাহিত্যের
জন্য শোকপ্রকাশ করি আর মিসিংলিংক
খুঁজে না পাওয়া গবেষকের নাক কুঁচকে ওঠে
সন্দেহে। আহা ওকে কোনো দোষ দিও না সোনা,
সন্দেহ ছাড়া আর তো কিছুই নেই, যা দিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে
ইতিহাস লেখা যায়, আরক্ত ফুলের রঙ সবুজ
বলে ভেবে নেওয়া যায়, আরো যেন কত কিছু হলো,
সবিনয়ে বৃষ্টিকে-ওগো চালিয়াত, দয়া করো গ্রীষ্মকালে।
ঘন ঘন ফ্ল্যাশগান ঝলসে ওঠে আদর্শবাদীতার দিকে।
তবু তো জানি, এসব আর কিছুই নয়, কোমরে কোমর
লাগিয়ে সরীসৃপ হবার ছক...

ওয়েটিং রুম

সমস্ত অপেক্ষাজুড়ে সোঁ সোঁ বাতাস বইছে, হাওয়া নয়,
বাতাস বইছে। আর নিচের গাছতলায় তিলধারনের
জায়গা নেই। সবাই সরে সরে বসছে একে অপরের দিকে।
কারোর গায়ে ঘামগন্ধ। কারোর মদগন্ধ। কেউ কেউ
চিঠি লেখার প্রয়াস নিয়ে শিকড়ের দিকে যেতে চাইছে।
যারা দুপুরের রোদে সাময়িক দৃশ্যটুকু গড়িয়ে নিয়েছে
দু-এক ফোঁটা জলে তাদের আজ কোনো ভুলভ্রান্তি নেই।
বাকিরা নিয়মাবলির কাছে অপেক্ষমান। এলোমেলো দুপুর
ক্রমশ বিশ্বাসহীনতার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। আমরা
তোমাকেই বলছি, ধাবমান, একটু দাঁড়াও দেখি, কথা শোনো,
দাবিদাওয়া বুঝে নিতে শেখো, আর স্পষ্ট করে বলো,
অপরাহ্নে বৃষ্টি এলে গাছেদের জ্বর হয় কিনা...

দে ব র্ষি স র কা র

কথা

যেভাবে সম্পর্ক চেনা যায় আমি সেভাবেই চিনি
না চেনার ভান করে শুয়ে থাকি টানা দশদিন
বিছানা গুটিয়ে নিতে নিতে বোঝা যায়
কখনো নিজের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ভালো

শর্ট ফিল্ম

কার্য আর কারণের মাঝে
খান খান হয়ে যাচ্ছি দ্রুত
দেহখণ্ড রিনিরিনি বাজে
মৃত্যু লোক ভোলানোর ছুতো

বিকলাঙ্গ পুরুষের জামা
গায়ে দিয়ে ভানুমতি খেল
সাজিয়ে রেখেছি গলিপথে
ছ-দিনের হারানো আপেল

দাঁত বসাতেই ঘণ্টা বাজে
কাঁধে এসে বসে এক পরী
আমি তার দু ডানার ভাঁজে
প্রতিটি কামড় জড়ো করি

ইনসমনিয়া

চিত হয়ে শুয়ে আছে ভায়া ঘুম, ঘুমের বিষয়
ওরা কি তোমার কেউ হয়?

সহায় শুধু পাহাড়ি বস্তির মত খাট
সারা অঙ্গে শীতের আঘাত

ঢেকে রেখেছিল একটা রোঁয়া ওঠা পুরনো কম্বল
রাতে বাসি রুটি আর ঝোল

ঝোলের ভিতর কাটা সবজি নাকি ভুলের সুরাহা?
যদিও সুস্বাদু খুব, আহা!

জিভের তলায় জড়ো হওয়া কিছু রূপালি উদ্বেগ
মরিচ-দানির মতো মেঘ

ওরা জানে এ শহরে ভালোবাসা পাওয়া যায় বলে
ভাঙাচোরা ঘুমের বদলে

কাদা আর বিষ্ঠা তুলে মাখি
মুখোশ বদল করে আমরা সারারাত জেগে থাকি

প লা শ দে

বর্ণমালা

তোমার সমস্ত দেয়াল আমার কান ধরে টানে
টানছে, পাশের বাড়ি টপকিয়ে আসমান অব্দি
আর আমি খুঁজি নয়া বর্ণমালা

খুঁজতেই থাকি ততদূর
হে অগ্নি মৃত্তিকা হে বায়ু পূর্বপুরুষ
দাও অক্ষর আমাকে একটি বার অন্তত
ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলার মতোন
ভাষা মন্ত্র কোনও—

সেই কোন সে পলাশদেশ থেকে
এসেছি, তোমার আলতামিরায়

দোসর

কোকিল ঢুকে যাচ্ছে সমস্ত আজ মেহেমান
নিজেকে পেরিয়ে কী জানি কোথায় কীভাবে

কুহু ডাক, ডাকো, চোখ ভিজিয়ে দাও দুপুরের
পাতো আরশিনগর
এদিকের আখড়া থেকে ও পাশের দোয়ায়
খুব
বন্ধুত্ব কেঁপে ওঠে

একতারায় ঘাই দিচ্ছে দোসর

জগদ্দল, অযান্ত্রিক, আমরা

ঢক ঢক ঢক ঢক

আহ্ শান্তি

চল রে এবার জগদ্দল
হাত পা ছড়িয়ে তার পর নেশা করি
গান গাই আজ খুব ফূর্তি হচ্ছে
বাতাসে কী লাজুক দুনিয়া হচ্ছে দ্যাখ্
এমন কী এই লৌহমন
ধোয়ার শরীরত্ব ঢেকুর তুলছে

আমাদের নিয়ে আর কেউ
হাসাহাসি করবে না দেখে নিস—
একে অন্যের পাঁজরে সওয়ারি হয়ে
গ্রামের বাড়িতে চল ঘুরে আসি
বহুদিন বাদে আজ ছুটি

কী রে, পারবি তো?

পি য়া ল ভ ট্টা চা র্য

চৈত্রদিনের লিরিক

১.
আকাশ, রোদে পুড়ছে ক্রমাগত
বুকের মাঝে চাতক হাহাকার
এমন দিনে আমি ও তুই পথে
নেমেছি, পেতে মৌল অধিকার

দাবিদাওয়ার যুক্তি কিছু নিয়ে
বেঁধেছি প্রাণ, ধনুকভাঙা পণে
হন্যে হয়ে সত্যিটুকু খুঁজি
মুখচ্ছবির অভাব অনটনে

খুঁজতে গিয়ে ঠেকেছি প্রতিপদে
বিরুদ্ধতা ঢেকেছে আশরীর
আমি ও তুই তবুও অনুভবে
পেয়েছে মীরা, কখনো তিতুমির

কে জানে এরপর কী আছে রাখা
শরীরে গান বাজায় বিশ্বাস...
সেখান থেকে আমরা লিখে নেব

ঋতুর গায়ে দ্রোহের সন্ন্যাস।

২.
এমনি করেই যাই যদি তবু মোমের ভিতর ঘরে
পাখির ডানার ঝাপট লিখছি বিরুদ্ধতা, ঝড়ে

সেখান থেকেই পালকে পালকে লুকিয়ে রাখছি ক্ষত
প্রতি না-পাওয়ার মধ্যে আমার ভালবাসা জাগ্রত

সেই জাগরণ ছুঁয়ে থাকা আর জেগে ওঠা বিশ্বাসে
নিয়ম ভাঙার সাহস খুঁজছি অথৈ সর্বনাশে

সর্বনাশের দুকূল ছাপিয়ে ফিরে পাওয়া প্রেমে তাই
আবহমানের কথার বাইরে অক্ষরে লিখে যাই

পাখির নীড়ের উপমা বদলে আগুন রঙের ফুল
তোর চোখ জুড়ে রেখেছি, তবুও তাকাবিনা নির্ভুল?

৩.
একমুহূর্তে ভিড়ের ভেতর থেকে
সুযোগ পেয়েই আলাদা হয়েছি, আর...

বাইরে তখন বিকেল নামছে ধীরে
ফাঁকা রেঁস্তোরা, মেনেছে অন্ধকার

এরপর কত হাসাহাসি, ভাগাভাগি...
স্থগিত থেকেছে পুরাতন দাবিদাওয়া

আলতো আঙুলে পিয়ানোরা বেজে ওঠে
নখদাগ জানে স্পর্শের পথ চাওয়া

এ চাওয়াটুকুই থেকে যায় চিরকাল
এ চাওয়াটুকুই চিরকাল আধচেনা

বাকি পড়ে থাকা কথার শূন্যতাকে
তুই ছাড়া, কেউ কোনোদিন জানবে না

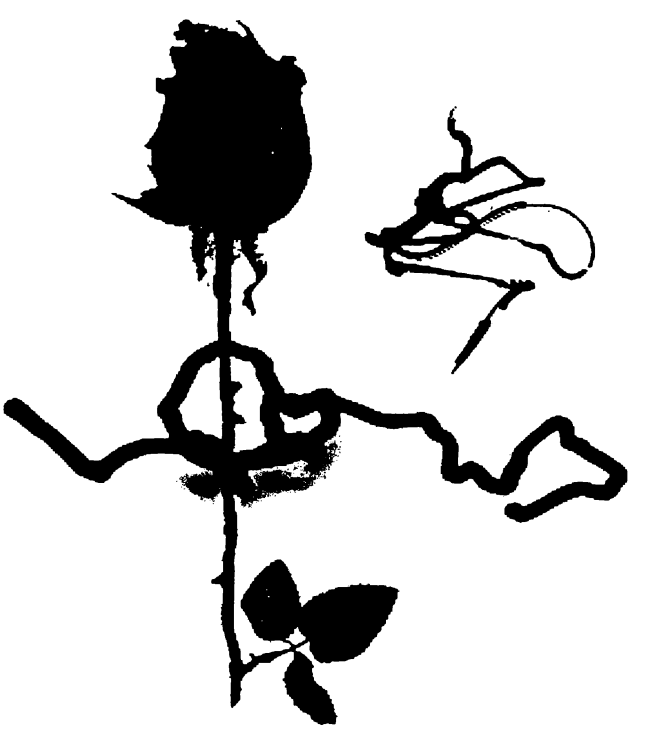

রা জ দী প পু রী

আইনক্স-সিটিসেন্টার, ই-৪০৫

১.
অচেনা পুরুষও তাকে আপন ভাবে,
চায় শুশ্রূষা...
সেও মৃদু হেসে
বাড়িয়ে দেয় হাত— মেপে নেয় জ্বর,
পারদের ওঠা-নামা...

পলকে পলক গড়ায়

ফালি চাঁদেও টইটই করে জোছনা...

২.
আহ! এই কাকজোছনায়
ও মন,
আজ তোর মেঘজন্ম হোক

পুতুলসংসার পড়ে থাক,

পড়ে থাক বৈধ অবৈধতা—

প্রলাপও অপ্রলাপ হয়ে ওঠে— পাপ, পুণ্য, পুণ্য, পাপ—
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়,
ভেসে যায় আমাদের আদরের নৌকা...

৩.
মরশুমি ফুলের মতো এইসব সম্পর্কেরা...

আশনাই গন্ধে সারারাত ভরিয়ে রাখে
মুঠোর ভেতর—

তোমারও প্রেমিক আছে, আমারও প্রেমিকা

তবু চোখাচুখি,
তবু আত্মহারা...

'ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ
বসন্ত'...

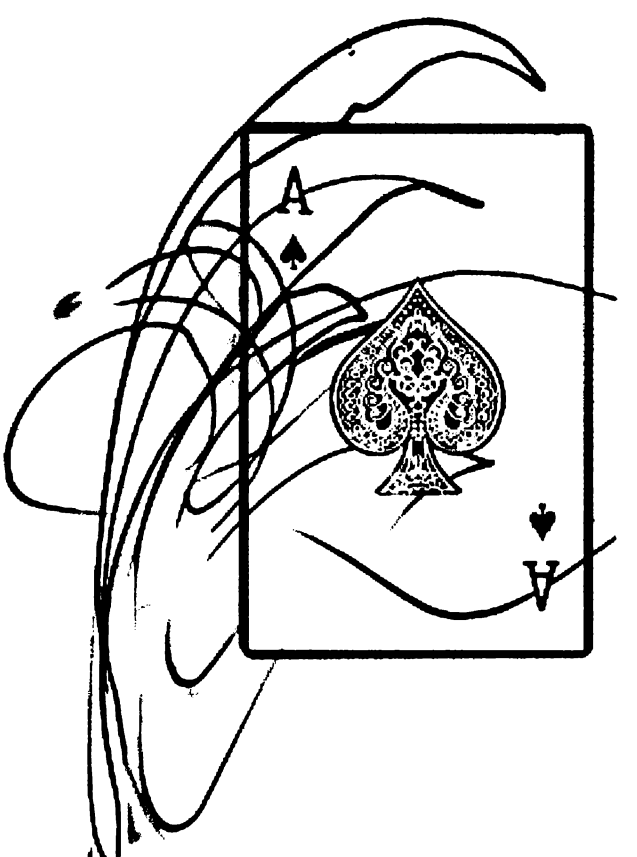

শৈবাল সরকার

দাবার অন্ধ দু'জন

১.
আপাত সরল এইসব
গাঢ় শীতের দিন
অভ্যস্ত পায়ের দিকে
হা-মুখে তাকিয়ে থাকে জল।
হারানো শ্বাপদের সাথে
পুনরায় দেখা হয় পথে
আমাদের মাঝখানে নদীর শরীর,
কুয়াশা প্রেরিত কেউ
দু'দিকে ইশারা সাজায়,
খুব কাছাকাছি এনে দেয় বাসস্টপগুলি

সোয়েটার কাঁধে নিয়ে আমরা
একে অন্যের বাড়ি ফিরে যাই।
চেজ-এর চরিত্ররা।

২.
পরবর্তী পদক্ষেপে আমি
তোমার পেছনে চলে যাবো।
কাঠের চুলে ভরে দেবো
মন্দিরের নগ্নপিঠ, পিঠের ব্যহত সিঁড়ি...
আসন্ন বিষাদে তুমি আবলুসী বেড়াল
নামিয়ে দিও বরফের মাঠে
যার পায়ে পায়ে অ্যাসাইলামের ধ্বনি...
মন্ত্রী ও ঘোড়ার মাঝখান দিয়ে
সে চলে আসবে
আমার শোবার ঘরের দিকে...

হাওয়ার ফেরারি

ঘুমের শেষে সমস্ত পলি বেয়ে
ধুলোঝড় ওঠে।
বাংলোর পেছনে তোমার
নিকোনো শালু, আদিগঙ্গার ডুবোজাহাজ
পুনরায় ঘাই মারে।
ট্রেনের শব্দে অনাহার আসে।
অনাহার বাড়ি ফিরে যায়।

চশমা ও বইমেলা নিয়ে
আমারও গল্প মনে পড়ে
তোমার কান্না ছিল হারিয়ে ফেলার

কিছু একটা ফেরাবো বলে
আবারো প্ররোচনা দিই
তোমাকে বা অতীত তোমার।

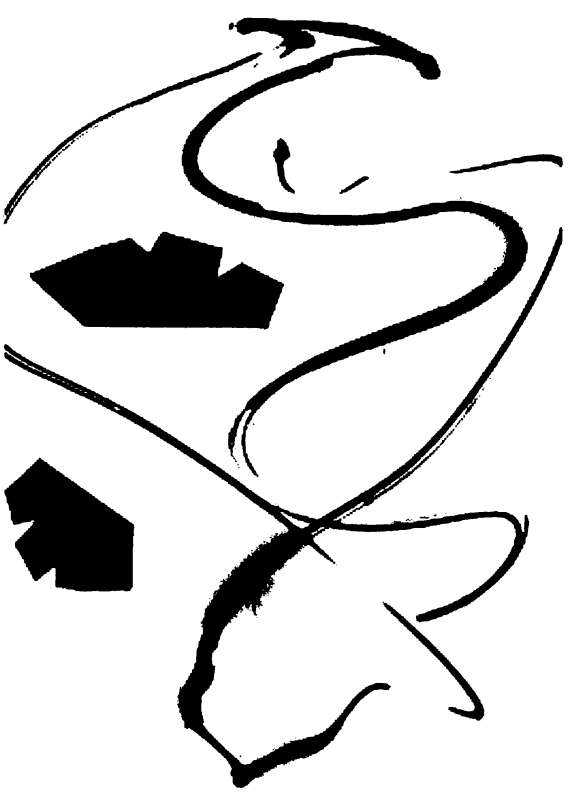

শ্রে য় সী চৌ ধু রী

বৈশালী ১

ঝিলের উপর একটি শহর তৈরী হচ্ছে রোজ

এমন রোশনাই আর এমন বেলুন আমি
দু'টাকার চানাচুর কিনে ঘরে ফিরছি

কতো কথা বলা বাকি রয়ে যাচ্ছে আমাদের

আমি পৃথিবীর কলঘরে আজকাল
ঝর্নার শব্দ শুনতে পাই, দরগায় দরগায় জাফ্রি হয়ে

উৎসব এসেছে...

মেয়েটি রোদচশমা পরে নেয় দুপুর নাগাদ
আমি পৃথিবীর করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকি একা

রোজ রাতে একটু করে শহর টাঙানো হচ্ছে ঝিলের উপরে...

বৈশালী ২

আজব মাস্তুল থেকে পরী নামে রাতের শহরে
কবরে আমার ফুল, পড়ে থাকে রোজ

মৃতের আড্ডায় ভারী মরমিয়া গান গাইছে কে ও

বাড়ি ফিরিবার পথে আজকাল আমায় কেউ
পিছু তো ডাকে না, আর আমার সাধের ফুল
পড়ে থাকে রোজ
আমি একটা বাবরের ছবি আঁকি
তারপর ঘুমিয়ে পড়ি ছাতে—
রাতের বাগান থেকে পরীদের গান ভেসে আসে—

আজব মাস্তুল থেকে ঘুম নামে আলোর শহরে

বৈশালী ৩

আলো, আলো, আলো... বড় আলোয় ধাঁধিয়ে যাচ্ছে
আমাদের উঠোন—

আমরা কুলুঙ্গি থেকে ঈশ্বর নামিয়ে নি
গয়নাগাটি পুরে রাখি তাতে—

দিগন্তের কারশেডে রঙিন কাগজ সাঁটা চলে

এমন জমকের দিনে বন্ধুদের চিঠি লিখি
বড়দের জানাই প্রণাম—

উৎসব ফিরি করে বাড়ি ফেরে পোষ্টম্যানওলা—

ঈশ্বর সামান্য প্রতিবেশী— বাড়ি বয়ে ভাত খেয়ে যান

অনঙ্গ, ঈশ্বর তুমি, আমাদের মার্জনা করিয়ো—
ঘুমের সংস্থান দিয়ো রাতে

স ঙ্ঘ মি ত্রা হা ল দা র

যোজনা

১। বিকেলের দিকে একটা প্রায় পড়ে আসা রাস্তা
আমি শর্টকাট রাখছিলাম। মানে বিবাহ প্রস্তাব

২। রঁদেভু উৎস থেকে আজ যোজনা হচ্ছে শালিখ
এইখানে এক পলাতক কিশোরের ঘোর
অর্ধনমিত সিঁড়ির বিগ্রহে চাপা পড়ে আছে

আলোর এপ্রিল

১। মূর্ধা স্পর্শ করছে দুপুর
শুঁড় বাড়ানো একটা রাস্তা ঢুকে আসছে পেটের মধ্যে
চারিদিকে বাড়ির নকশা টুকি দিচ্ছে

২। একা একা তোতলামো ভরে দিচ্ছে এপ্রিলদিন
বার্তার পাঁচিল টপকে উগ্রপন্থী হাওয়া...

হাইকু

ক্রমশ সরে যাচ্ছে আলোর নজরকাড়া ভাব

ওষধি এক প্রাচীনতম ঋতু

কেউ গান বাঁধছে দোটানার...

সোমব্রত সরকার

গন্তব্য

স্বচ্ছন্দে বলেছ : শালুয়ার নতুন পোষ্টমাস্টার
তোমার কেমন যেন এক দাদা হয়। আমি পাড়ার পিওন
একটা রেজিস্ট্রি হাতে সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি।
মেসবাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে গিয়ে সোজা দোতালায়
একদিন চিঠি দিলে বকশিশ মিলেছিল। গিয়ে
দেখি ও ঘরেও তালা ঝোলানো। সদর বন্ধ করে
ওরা যেন কোথায় গিয়েছে। কলতলায় রাতের
এঁটো বাসনের স্তূপ নিয়ে বসে পদ্মদিদি সংবাদটা দিল।

চেনে কিনা ওকেই জিজ্ঞেস করি আমি। বলেছিল
পুজোর কাপড় মনমতো হয়নি বলেই কাজ
ছেড়ে দিয়ে এসেছিল তোমাদের বাড়ি। আমি বেশ
চিন্তিত মুখে সহিষ্ণুতা নিয়ে মন স্থির করে ফেলি। চিঠি
ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবি পুনরায় পোষ্টাপিসে।

পরে তুমি নিতে এলে আমি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত পিওন
সেই হলে বলি : খুশি মনে ফিরে যান
আবার কোনওরকম চিঠি এলে পৌঁছে যাব ঠিক
আপনার বাড়ি। তুমি মৃদু হেসে বলো
নতুন পোষ্টমাস্টার চেনাজানা। অসুবিধা হবে
না কিছু। জিজ্ঞেস করি : কে হন? তোমার দাদা শুনে
আরেকবার প্রথম থেকে আমি ঠিকানার বিবরণ শুনি।

আঁচড়

তোমার শ্রীহীন নামে সহসা এসেছি ঘোড়াগাছা।
অথচ অশনি হয়ে পথ পড়ে আছে পার্শ্ববর্তী
জগপুরে! সুপ্রাচীন আস্তাবলে মেরীর কোলেতে
যাও দেখে আমি তবে সংবিৎ হারাই, আর কিছু
বড়দিন খর্বকায় আমার আলোকে নিয়ে ফের
বাতাসে আঁচড় কাটে। বলো তুমি ঘোড়াগাছা, ছিল
কে সেবার পদাহত মানুষের সওয়ার?

ধুলোর আশিস দিয়ে তুমি কত বধ্যভূমি গড়ে
অনুপম শীতে এসে বাজাও রুদ্রের সমাপণ।
আমি অন্ধকারের লোক। আস্তাবলে গিয়ে ঠিক
জেগে উঠি যবনিকা পতনের আগে। পথশিশু
বলে ভুল করো তুমি। প্রসারিত করো ছেঁড়া
ঘণ্টাধ্বনি। জেনে যাও আমি সেই নির্মম ফাদার
তোমাকে দলিত ভেবে দীক্ষা দিয়ে বসি ক্যাথিলিকে।

তুমি তো সহজমেয়ে, মেরীর গোপন চিহ্নগুলি
নিয়ে রুগ্নস্বাস্থ্যে আজ আমার সন্তান ধরে থাকো
একটি সবুজ দিনে বাড়ি এক ভগ্ন আস্তাবল
প্রকাণ্ড শূন্যতা ঘিরে পেরোই ঘোড়ার ক্ষুরতল।

নোলক

দাদপুর যেতে গিয়ে মনে পড়ে নাকের নোলক।
সম্বল এটুকু, আর দগ্ধ মিনতির মাঝখানে
ফুটে ওঠে গোচারণ। গাভীর বাঁটের স্ফীতমুখে
বাছুরের সুরমাখা আলোকচূর্ণকে ছুঁয়ে বসি।

শান্ত হতে বলি তাকে। সে আমার অনন্ত চরণ।
কোন পথে গান ধরে, গৃহস্থের অগোচরে গিয়ে
চেয়ে বসে মুষ্টিভিক্ষা! কোন দানা দেবে তুমি তাকে?
চালগমে বিজনের খেয়াঘাট। কুপি জ্বলে ওই—
রাত্রিকে পিছনে ফেলে রুক্ষমুদ্রা হাওয়ায় গড়ায়।

আলিনগরের দিকে অতি ধীরে আমাকেই ডাকে।
আমি তাকে বলি : স্তব্ধ, ঘন তমসার নীচে কিছু
জটাজাল রেখে এস। আগে নীরবতা হও। ফের
দ্যাখো সম্মিলিত ঝড়ে দু'একটা হাওয়ার কুচি সরে
আর্তরব জেগে ওঠে। তুমি ভেবো মৃদু অনুমতি
গৌরব ছড়ায়, কাঁপে খইয়ের আকাশে শুভাশুভ।

নাকের নোলকে গিয়ে খুঁজে পায় রোদের বিরহ।

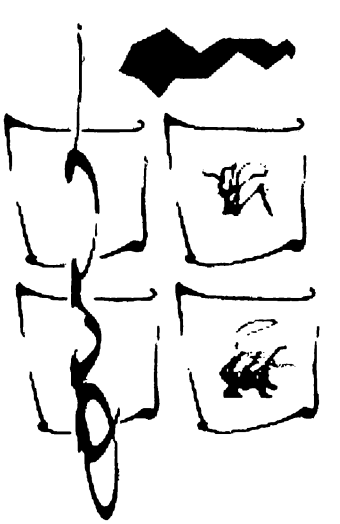

সৌপ্তিক চক্রবর্তী

হাততালি

গণিতের নিচে কনা ভারী হয়ে এল
প্রেমের দিকে সুরাগন্ধ
এত কি রোজের কথা
কখনো কখনো দোলাচল
হৃত দিনের যত সুর ও ভ্রম
হাতকে হাত আজ
তালি দিতে বলি খুল্লাম বাজারে

ক্রীড়া

রচনা হয় না কিছু
রচিত হওয়ার এই ক্রিয়া
যতি কাঁধে কাঁধে ঘোরে
তালুতে তালুতে

করমর্দন আয়ত্ত হয় আর
পুরনো মুখ শার্সিতে
বারবার

ধারাবিবরণী

ঋতছাপ রয়ে গেল ঘিলুতে ঘিলুতে
কোলাহল বিমূঢ় বচনে
এক ও বহুগুনে দেখা হল
অনুক্রম
ফলিত মুক্তির রসায়ন
রাখা হল আনত সকালে
টেরেসে টেরেসে

ডিম

নিথর গ্র্যানিটে
কুড়িয়ে পেয়েছি তোর মুখ

বিলুপ্ত পাখির ডিম—

মুখে নিয়ে ঝোপঝাড়
ভেদ করে গেছি তিরবেগে

পেছনে পেছনে ধাওয়া
করেছে উল্কার ঝাঁক

বেঁকেচুরে যাওয়া ছায়াপথ

কুয়াশায় ম'রে যাওয়া এই
শহরের পেটের ভেতরে

তোর মুখ আগলে ব'সে আছি

বরফের কুচি-জমা চোখ
ফুটে যদি পাখিরা বেরোয়...

সম্মতি

তোমাকে সম্মত ভেবে কতবার খুলে গেছে লাভা

খনিজ প্রস্তাবে
মাটির অনেক নীচে ফুলে ফুলে উঠেছে শেকড়

খুঁজেছে অন্ধের চেয়ে আরও অন্ধ
পেশী আস্ফালনে
নুন, লোহা, জলের মুলুক

আলোর সম্মতিক্রমে, ভোর,
ফুটেছে মুকুল

তোমাকে ঘিরেছি আমি লাভার ভেতরে থাকা
সহস্র বছর-ব্যাপী ঘুমে

শীত - ২

কে যে কাকে আঁকড়ে আছি
বুঝিনি এখনও

সারা রাত ট্রাক চলে যায়
মমর্থ টায়ার

জানালার কাচে আলো ছিটকে দেয় শুধু

এঁকেবেঁকে নেমে আসে ঘাম

কে যে কাকে ছেড়ে যাব
বোঝার আগেই

চিবুকের প্রান্ত থেকে ঝরে পড়ে আমার কিশোর

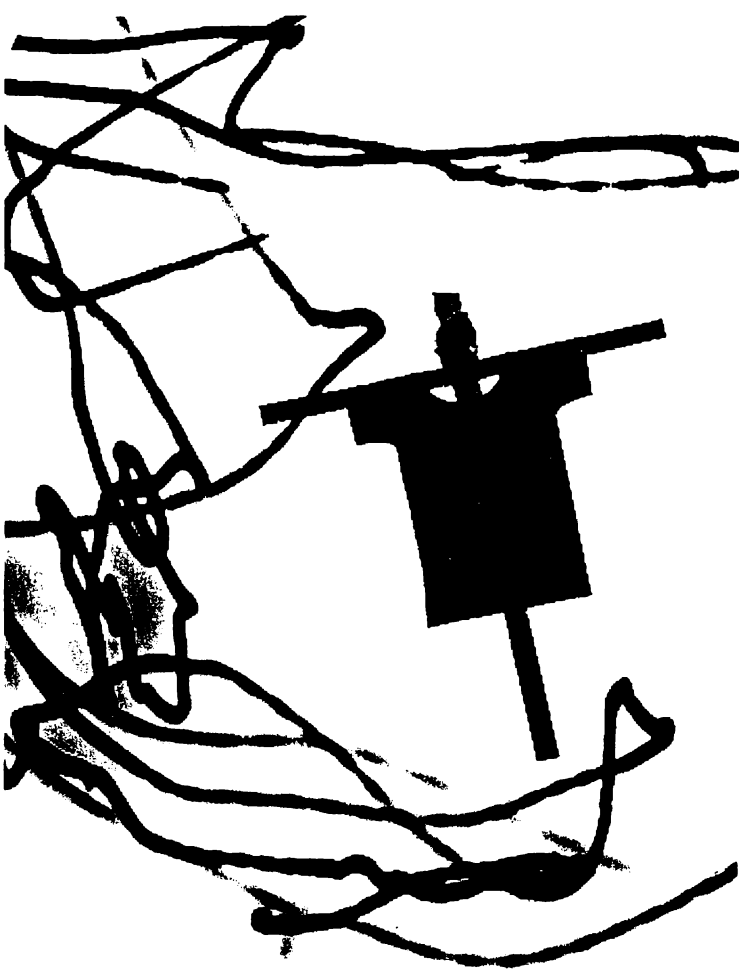

একলা ঘর

বি শ্ব দী প দে

আমরা ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছি। একা। আমাদের চারপাশে গজিয়ে উঠছে দেওয়াল। তার ভেতরে আমরা, দেশলাই বাক্সে বন্দি জোনাকীর মত ছটফট করছি। আমাদের দেহের উত্তাপ ও আলো সবই ব্যর্থ প্রয়াসে গুমরে মরছে এই চৌহদ্দির ভিতর। কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। সকলের অজান্তে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি। সকলের থেকে। নিজের থেকেও কি হারাচ্ছি না?

এক অদ্ভুত বিপন্ন সময়। সব সময়ই ঝুলছে অদৃশ্য খাঁড়া। এই দিব্যি চাকরি করছি। সুবাতাস কেটে বেড়িয়ে যাচ্ছি দ্রুত। হঠাৎ বিশ্বজুড়ে এক বিরাট রাক্ষস অর্থনীতির বিপর্যয়ের অজুহাতে গপ্ করে গিলে নিচ্ছে সমস্ত সুখ। এই কানে মোবাইল, হাতে বা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে নিত্য অফিস যাত্রীর তক্‌মা এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আচমকা বিরাট বিস্ফোরণে স্রেফ তালগোল পাকানো একটা 'বডি' হয়ে যাচ্ছি। এভাবেই চলছে। এক বিপজ্জনক শঙ্কার সাথে নিত্য বসবাস। এক অনিশ্চয়তার ছায়ার মাথার ওপর প্রত্যহ দুলে দুলে যাওয়া।

শুধুই কি বহির্জগত? সাথে সাথে মনের ভেতরের প্রবল অনিশ্চয়তা? সেটা কি কম কিছু! সম্পর্কের পাল্টে যাওয়া। ভেঙে যাওয়া। চুরমার হয়ে যেতে যেতে ফিরে আসা। আবার নতুন সম্পর্ক। আবার নতুন অনিশ্চয়তা। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আত্ম-অবলোকন। নিজের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া, তবে কি আমার মধ্যেই রয়ে গেছে সহানুভূতিহীনতা, স্বার্থপরতা ও নির্মমতার বীজ? আর ক্রমশ আরও জটিল হয়ে যাওয়া...

এই হলাম আমরা। আর এই হল আমাদের বেঁচে থাকা। আপনারা বলবেন, 'বিপন্নতা তো আমাদেরও ছিল।' আমরা বলব ছিল, নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু অন্য রূপে ছিল। অন্যভাবে ছিল। আর ছিল একটা বিশ্বাস। কোনও এক অমিতাভ বচ্চন বা অরণ্যদেব আসবে আর বলিষ্ঠ মুঠিতে ধ্বংস করে দেবে সমস্ত বিপদ। নায়িকাকে পিছনে বসিয়ে বাইক আরোহী নায়ক ক্রমশ অদৃশ্য হবে দূরে। 'দ্য এণ্ড' ফুটে উঠবে। আর সবাই খুশী মনে ঠাণ্ডা পানীয়তে চুমুক দিয়ে শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরে যাবে। সেই বিশ্বাস আমাদের নেই। আমরা বিশ্বাস খুঁজতে বেড়িয়েছি। আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস। আর সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে সমস্ত এনার্জি ফুরিয়ে ফেলে আমরা ব্ল্যাকহোল হয়ে যাচ্ছি। ব্ল্যাকহোল, দুটি ব্ল্যাকহোল মুখোমুখি হলে শুরু করে দেয় মহাজাগতিক নৃত্য। আমরা, এই অসংখ্য ব্ল্যাকহোলেরা মুখোমুখি হয়ে যে নৃত্যমালা রচনা করেছি সেটাই হয়ে উঠছে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের শিল্প। এক অলোকসামান্য নতুনতা।

২.

সেই কবে এক নষ্ট্রাডামসের চেয়েও শক্তিশালী দ্রষ্টা পড়ে ফেলেছিলেন আমাদের মনটা। আর বুঝে ফেলেছিলেন 'তোমার আমার ফারাকের নয়া ফন্দি।' পৃথিবীর কিমাকার ডায়নামোর পরে যে মহীনের ঘোড়ারা ঘাস খেত তাদের পুণর্জন্ম হয়েছিল আমাদেরই জন্য। অথচ ভিন্ন সময়ের কণ্ঠ তারা। কিন্তু তাদের সুরে আমাদেরই যুগ বিম্বিত হয়। আমাদেরই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি ফুটে ওঠে। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই আমাদের। 'প্রস্তর যুগের ঘোড়াসব', তবু তারা পেয়ে গেছিল এই তথাকথিত ICE AGE-এর (Information, Communication and Entertainment) অভ্যন্তরস্থিত প্রকৃত শৈত্যের খোঁজ। সেই কঠিন বরফের চাঁইতে তাই তারা এত অনায়াস আঁচড় কাটতে পারে। 'যখন ধোঁয়া মেঘে ঢাকা' থাকে আমাদের মন, রগ বেয়ে চুঁইয়ে পড়ে বিষণ্ণতা তখন তাই ওদের গান এভাবে সংযোগ সাধন করে ফেলতে পারে। 'আকাশে ছড়ানো মেঘেদের কাছাকাছি' পৌঁছে দিতে থাকে আমাদের।

পথটা ওদেরই তৈরী। ক্রমে তাতে পাড়ি জমাতে থাকে আরও অনেকে। নিজস্ব প্রশ্নমালা নিয়ে। 'আমরা ভীষণ একা / বাঁচব কি বাঁচব না। স্বপ্ন যাবে কি দেখা?' হ্যাঁ আমরা আবার স্বপ্ন দেখার অধিকার চেয়েছি। ভুলতে চেয়েছি সমস্ত না পাওয়া। বালিশে মাথা গুঁজে দাঁতে দাঁত চিপে বলে উঠেছি, 'এই একলা ঘর আমার দেশ। আমার একলা থাকার অভ্যেস। আমি কিছুতেই ভাববো না তোমার কথা ...' কিংবা পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে শিস দিতে দিতে হেঁটে গেছি বেপরোয়া ভঙ্গিতে, 'কেয়ার করি না। যদি তুমি চলে যাও / জন সমুদ্রের ভীড়ে ধীরে মিশে যাও / কিছুটা সময় ছিলে সেই তো অনেক।' এইভাবে, এইসব গানে, গানের কথায় বা তার সুরে সমর্থন খুঁজে পেয়ে নিজেদের কাঁধে হাত রেখে বেড়িয়ে পড়ছি এক সুহানা সফরে।

৩.

প্রত্যেক সময়েরই নিজস্ব একটা স্বর আছে। সেটা সেই সময়েরই উৎপাদন। এই স্বর অশ্রুতপূর্ব। আর তাই অনেকেরই মনে হতে থাকে এটা কোনও উৎকর্ষ শিল্পরূপ নয়। এরকম তো আগে শুনিনি। এটা প্রতিযুগেই হয়েছে। হচ্ছে। হবে। গত প্রজন্মের লোলচর্মসার জ্যাঠামশাইরা প্রজন্ম ফারাককে অস্বীকার করে বসেন। এ যুগও ব্যতিক্রম নয়। 'তোমাদের গান কর্কশ। চিল-চিৎকার। সময়ে সময়ে বেসুরোও।' উড়ে আসা অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়ে এক টিভি অনুষ্ঠানে অসাধারণ উত্তর দিতে শুনেছিলাম আমাদেরই এক উজ্জ্বল মুখকে। তিনি

বলেছিলেন, 'হতে পারে। ক্ষোভ বা কান্নার সময়ে আমাদের কারোরই কি খেয়াল থাকে, সেটায় সুর বসছে কি না?' রূপম ইসলাম, সাম্প্রতিক বাংলা গানকে যিনি সর্বাধিক ঝাঁকুনি দিয়েছেন, তাঁর এই উত্তর অনেককেই খুশী করবে না জানি। বলা হবে ক্ষোভ, কান্না এসব তো হাজার হাজার বছরের পুরনো। যেদিন থেকে মানুষ, সেদিন থেকে এই অনুভূতিরা আমাদের সঙ্গী। কিন্তু কান্নার স্বরলিপি যে যুগে যুগে স্বতন্ত্র হতে থেকেছে — একথাও কি আমরা মানব না? যে সংকটের ভেতর দিয়ে আজ আমরা চলেছি প্রথম বিশ্বে তা এসেছে আরও বহু আগে। ফলে রক সঙ্গীত ওখানে এসেছে বহু সময় আগেই। এখন আমাদের পালা। আমরা ছিদ্রান্বেষীদের দূরে সরিয়ে দিয়ে তাই দলে দলে ভীড় জমাবো নজরুল মঞ্চ বা অন্যত্র। হটকেকের মতন ফুরিয়ে ফেলব সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যাণ্ড-গীতির অ্যালবাম। কারণ এ ভাষা আমাদেরই ভাষা। আমাদেরই স্বর।

৪.

রক কোনও গান নয় শুধু। তা একটা দর্শন, একটা অ্যাটিটিউড। সমস্ত দর্শন যে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতেই হবে, এমন কথা কেউ বলবে না। হয়ত আপনার জীবনযাপন বা আপনার সংকটের কোনও খোঁজ ওরা দিতে পারছে না। হতেই পারে। কিন্তু তা হলেই যে তাকে 'চিৎকৃত উল্লাস' বলে মুখ বিকৃত করে ফেলছেন আপনি সেটাও তো কোনও সুবিচার হল না। আমরা যারা দারুণভাবে একাত্মবোধ করছি ফসিলসের সাথে, ক্যাকটাসের সাথে বা লক্ষ্মীছাড়ার সাথে বা নতুন কোনও জায়মান রকব্যাণ্ডের সাথে তাদের সবাইকেও তো তাহলে আপনি অস্বীকার করছেন। এতজনকে একসাথে অস্বীকার করতে চাওয়াটাও কি ঠিক? আপনিই বলুন! তাহলে তো প্রকৃত অর্থে আমাদের বিপন্নতাকেই ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি।

সত্যি যদি তা না চান আপনি, আপনারা, তবে আসুন, আসুন আমাদের সাথে, আমাদের একলা ঘরে। 'প্রায় মুখস্থ তিনটে নোংরা দেওয়াল।' ঘরময় অগোছালো যৌবন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বইপত্র। মোবাইল ফোন। বিছানার কুঁচকে যাওয়া চাদর। সিগারেটের প্যাকেট। ল্যাপটপ। ঘরময় যেন একটা ভাপ। সেই ভাপে আয়নার কাঁচ অস্বচ্ছ। নিজের প্রতিবিম্বও পালিয়ে গেছে বহুদূরে। ঘরের কেন্দ্রে উপুড় হয়ে নাগরিক বিষণ্ণতার ছোবল খেতে খেতে নীল হয়ে পড়ে আছে যে, সে-ই তো আমি। সে-ই তো আমরা। আপনারা আসুন। আঙুল ছোঁয়ান আমাদের একাকীত্বে। দেখুন কী সুর ফুটছে। কান পেতে রাখুন। শোনার চেষ্টা করুন আমাদের গান। তবেই তো আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে এই গানে ভর দিয়ে শেষমেশ জেগে উঠছি আমরা। বেঁচে উঠছি।

৫.

আগেই বলেছি, বড় অদ্ভুত আমরা। বড় আশ্চর্য। আমরা অর্কুটে লগ ইন করে মুহূর্তে কথোপকথন চালাতে পারি বন্ধুদের সাথে। ফোন করা, এস এম এস পাঠানো এসবও করতে পারি যখন তখন। যদি কথা বলতে নাও চাই, কেবল মিস্‌ড কল দিয়েই নিজের অস্তিত্বের তরঙ্গ পৌঁছে দিতে পারি অন্যত্র। কত সহজ সব প্রক্রিয়া। সবাই কত কাছে। বিশ্বগ্রামের অধিবাসী আমরা। সবাই একসাথে আছি। একসাথে। তবু সময়ে সময়ে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। সবাই। আর তীব্র অভিমানে এক মস্ত শিশু হয়ে যাই আমরা। কেন ওরা কেউ ফোন করছে না? কোন কোনও স্ক্র্যাপ নেই দিন তিনেক? এমন কি সামান্য একটা মিস্‌ড কল। তাও আসেনি! ছেলেমানুষী অভিমান পাক খেতে থাকে শরীরময়। আমরা নিজের ভেতরে উবু হয়ে বসে থাকি।

অবশ্য আমাদের কোনও অভিমান-ই দীর্ঘস্থায়ী নয়। বিগত প্রেমিকার মুখ ভুলে যাই আমরা। দ্রুত নতুন বান্ধবীর হাত ধরে ঢুকে পড়ি ক্যাফেতে। কিন্তু অনেক রাতে আচমকা মিস্‌ড কল দিয়ে বসি পুরনো প্রেমিকাকেই। কেন সেটা কি আমরাও বুঝি? সেই বান্ধবী ফোন করলে কেটে দিয়ে ম্যাসেজ পাঠাই — সরি, ভুল করে দিয়ে ফেলেছি। তারপর নতুন করে বিষণ্ণ হয়ে যাই।

এরকমই আমরা। নিজেরাই নিজেদের কাছে অচেনা হয়ে যাই। মাঝে মাঝে। আনপ্রেডিকটেব্‌লও। তারপর এক সময় নিস্পৃহ হয়ে যাই। 'জেরক্স বুদ্ধি জেরক্স সত্তা' হয়ে জোর করে মুখস্থ করি নোট আর চাকরী পেয়ে যাই। গতানুগতিকতার ছকে হাঁটতে হাঁটতে নিজেরাই বুঝি না এটাই সেই পথ কিনা যেটাতে আমরা হাঁটতে চেয়েছিলাম। আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ে। বাবা-মা'র যেটুকু দেওয়া বাকি ছিল সেটুকু পূরণ করে ফেলি দ্রুত। কিন্তু তারপরেও অনেক কিছু বাকী রয়ে যায়। ভেতরটা যেন খালিই থেকে যায়। খালি।

৬.

জানি আমাদের সবারই গল্পটা পুরোপুরি এরকম নয়। তবে কাছাকাছি। কমবেশী একইরকম। যার গালভরা নাম নাগরিক বিপন্নতা। পাশাপাশি আরও সরাসরি অনেক কারণও অনেক সময় বিদ্ধ করে আমাদের। আর আমরা ক্ষুব্ধ হই। নিজের ওপর। জীবনের ওপর। সময় সময় সমাজের ওপর। এমনকি রাষ্ট্রের ওপরেও। এরপর যখন ধোঁয়া ঢাকা মঞ্চে প্রিয় গায়ক ও বাদকেরা তাদের সম্মিলিত সঙ্গীতে চারপাশ মাতিয়ে তোলে তখন সেই উন্মাদনা আমাদের রক্তকেও উষ্ণ করে তুলে ছুটিয়ে মারে সমস্ত শরীর জুড়ে। গায়কের কণ্ঠস্বরের আগুন আমাদের ক্ষোভের সমার্থক হয়ে উঠতে থাকে।

কিন্তু তা বলে রকসঙ্গীত মোটেই সমাজবিরোধীতার গান নয়। একটা প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বাংলা রক নাকি কেবল এই কথাই বলে— ড্রাগ খাও, মরে যাও। হাস্যকর! জানি না কারা এসব বলেন এবং বিশ্বাস করেন! কোনও শিল্পই

জীবনবিমুখ হতে শেখায় না। বলে না Escapist হতে। ওরাও তা বলে না। বলতে পারে না, শেষ পর্যন্ত রক সঙ্গীত তাই কেবল সত্যকে বিবৃত করে এবং তার সঙ্গে লড়ে যাওয়ার উৎসাহ জোগায়। আর পাঁচটা শিল্পের মতই।

৭.

শেষপর্যন্ত রকই তাহলে আমাদের পরিচয়? আর কিছু নয়? আর কিছু নেই? রবীন্দ্রনাথে আমাদের কোনও আশ্রয় নেই? সুমনে? কিংবা সমসাময়িক চন্দ্রবিন্দুর গানে? বা অন্য কোনও ধরনের সঙ্গীতে?

ভুল। এসবও আমাদের প্রিয়। যদিও তাতে রক শুনতে চাওয়ার ইচ্ছেতে ভাটা পড়ার কোনও কারণ নেই। কেন না রক শোনার কারণ এবং তা থেকে পাওয়া অনুভূতিটাই তো অন্য। আসলে রক সঙ্গীত আমাদের রক্তে যে দুরন্ত গতি আমদানী করে তা এক অভূতপূর্ব ও নতুন অনুভূতি। তাই একে আমরা ভালবাসি। এ একেবারে এই অস্থির সময়েরই উৎপাদন। সুতরাং অন্যান্য প্রিয় সঙ্গীতের সাথে এও আমাদের মনের মণিকোঠায় বড় আদরের, বড় আপন হয়ে রয়ে যাচ্ছে। যখন কোনও জমাটি কনসার্ট থেকে ফিরে আসি আমরা, আর অন্ধকার ঘরে শুয়ে কল্পনা করি সেই জমকালো সুর, তখন বুঝি এই সঙ্গীত এভাবেই মিশে যাচ্ছে আমাদের রক্তে। পরবর্তী সংকটের মুহূর্তে যা আমাদের নেতিবাচকতাকে চূর্ণ করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলবে এক সদর্থক জীবনের রঙিন উৎসবের দিকে। মনে হতে থাকে আমাদের সমস্ত জীবনটাই বুঝি এক রক কনসার্ট। প্রকান্ড এক মঞ্চ, ধোঁয়া ঢাকা। সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রচণ্ড হাততালি পড়ছে। আমরা এগিয়ে চলেছি সেদিকে।

জীবন ডাকলে যেতে তো হবেই।

এবার থেকে মেঘজন্ম

বছরে দু'বার প্রকাশিত হবে।

২৫ বৈশাখ কবিতাসংখ্যা।

লিটল ম্যাগাজিন মেলা গদ্যসংখ্যা।

পরবর্তী মেঘজন্মের গদ্যসংখ্যার বিষয়

রূপকথা

প্রকাশিত হবে জানুয়ারি ২০১১

গানগুলি মোর...

ম ন্দা ক্রা ন্তা সে ন

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কী এ, আপনারই আবরণ... গানখানি, স্বভাবতই, প্রথম শোনা আমার মায়ের গলায়। তখন মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ ডুবিয়ে সুর মেলাতাম। সুর হতো, কিন্তু মায়ের মতো তা গান হয়ে উঠত না। এই নিয়ে আমার খুঁতখুঁতানির অন্ত ছিল না। মা বলত, বড় হলে যখন কথার অর্থ বুঝে গাইবি, তখন আপনা থেকেই তা গান হবে।

এখন, বেশ কিছুদিন হলো, আমি গানের মানে বুঝতে শিখেছি। আবরণ একটু একটু করে সরছে। গান কেমন হলো, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। শুধু গেয়ে যাই। ঠেলে দে আড়াল; ঘুচিবে আঁধার... আপনারে ফেল্ দূরে... সহজে তখনই জীবন তোমার অমৃতে উঠিবে পুরে। জীবন পুরে উঠছে অমৃতে। মরব ঠিক করে অনেক অনেক ঘুমের ওষুধ জোগাড় করে যখন শেষবারের মতো তাঁর গান গেয়ে যেতে চেয়েছি, মরা আর হয়নি। শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে... আমার কাছে শেষ কথা বলেন রবিঠাকুর... চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না...

আমার লেখালেখি, তাও বোধহয় আমি লিখি না। কে একজন এসে দিয়ে যায়। কে উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি... হ্যাঁ, হয়তো আমারই ভেতর বাস করে সে। তার ক্ষমতা আছে ইথারে ভাসমান আমার লেখাগুলিকে আমার হয়ে হাত বাড়িয়ে আমার সচেতন সৃজনে টেনে আনার। আমি শুধু আমার বাঁশিটিকে শূন্য করে রাখতে শিখেছি। নিশ্চিন্ত হতে শিখেছি বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।

বাজাও আমারে বাজাও বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও।

হয়তো এ লেখা পুনরাবৃত্তিদোষে দুষ্ট। কতবার যে তাঁর গান নিয়ে লিখেছি আমি। কিন্তু যে কথা তোমার কোনো দিন আর হয় নি বলা নাহি জানি কারে তাই বলিবারে করে উতলা... আসলে, বাস্তবিক, যে কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি জানি না কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী...

আমি শুধু জেনেছি, আমার সামান্যতম নগণ্যতম সৃজনের ক্ষেত্রে আমি এক ভিখারি। চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে। কারে চায় সে? শান্তি? শান্ত এক শান্তি? নাকি অশান্ত এক সৃজনশীল পাগলামো, উন্মাদনা? কত পথ আছে বাকি, যাব চলে ভিক্ষা রাখি, কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে। বহুদূর সাগরপারের সেই গৃহপ্রদীপ আমার জন্য নয় আমি জানি। পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ডাক দিয়ে সে যায়। আমার ঘরে থাকাই দায়। তবে আমি এও তো জানি আমার এ ঘর বহু যতন করে ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে। আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে যদি আমায় পড়ে তাহার মনে... তাঁর জন্যে কখনও ঘরে বসে অপেক্ষা করি, কখনও বা পথে পথে... অপেক্ষাটাই একমাত্র যে কাজ আমার। হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে তব নিশ্বাসপরশনে, এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণসমীরণে।

এই যে আমায় চিরভিখারি বানানো, এ কার খেলা? এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে, হাসিতে আকাশ ভরিলে। আমিও তাঁর সঙ্গে হাসিকাঁদি। কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা, তারই মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা।... তাঁর গানের ডালা চিরজীবন বইতে পারব তো? আমরা ভয় লাগে... আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন... একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা... ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা। এইটুকুই আমার সকল ব্যথার নৈবেদ্য।

আমি গীতবিতান কোলে নিয়ে বসে থাকি, সদ্য অসুস্থতা থেকে উঠেছি বলে খোলা গলায় তেমনটা আর গাইতে পারি না, চোখে জল আসে। এই বসন্তে গাওয়ার কত গান ছিল তাঁর। সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার, তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার।

আর আজ... বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে। আমারও হা হা শব্দে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। আর কোনও দিন কি আমি গাইতে পারব না তাঁর গান? বিশ্বাস হয় না। পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়, ঝুলি ভরে রাখে যাহা-কিছু পায়... কতবার তুমি পথে এসে, হায়, ভিক্ষার ধন হরিলে... তিনিই কেড়েছেন, তিনিই ফিরিয়ে দেবেন নাকি? ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে, কাঙাল মরণে জীবনে। ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে দিনশেষে এল তোমারি আলয়ে... আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে নিজ মালা দিয়ে বরিলে। এই বেড়ালের ইঁদুর খেলার মতো প্রেম আমার আর সহ্য হয় না ঠাকুর... ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই। আমার বেশ প্রতিশোধের মতো আনন্দ হয় যখন বুঝি আমাকে কাঙাল করেও তাঁর নিজের কাঙালপনাও ঘোচেনি।

আমি প্রতিশোধ নেবার মতোই, শর্ত রাখার মতোই, ব্ল্যাকমেল করার মতোই গাই... আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে আমি তোমার বাঁধন নেব তুলে। যখন তোমায় আঘাত করি তখন চিনি। শত্রু হয়ে দাঁড়াই যখন লও যে জিনি।

মুক্তি দাও আমায়, প্রিয়, চিরসখা... যদি নেবাও ঘরের আলো তোমার কালো আঁধার বাসব ভালো। তীর যদি আর না যায় দেখা তোমার আমি হব একা দিশাহারা সেই অকূলে। আমি সেই অকূলে ঝাঁপ দিয়ে তোমায় তুলে আনতে চাই। তুলে

আনতে পারব কিনা আমি জানি না। সম্ভবত পারব না। কিন্তু এই যে ঝাঁপ দেওয়া, এই মুক্তিই বা কম কীসে।

এই সেই আর একটি গান, যা আমি আমার শেষতম আত্মহননের প্রচেষ্টার আগে গেয়েছিলাম। এই গানের ধাক্কায় সেই চেষ্টা কেমন বৃথা মনে হলো, আমি চারপাশে ঘুমের ওষুধ ছড়িয়ে জীবনে ফিরে এলাম। এরপর কী? ওরা ডাকে আমায় পূজার ছলে, এসে দেখি দেউল-তলে... আপন মনের বিকারটারে সাজিয়ে রাখে ছদ্মবেশে। এই মনোবিকার তুমি কখনও চাওনি ঠাকুর। তোমার প্রেমে যদি আমি সত্যি পড়ে থাকি, আমারও কি সেই বৈকল্য মানায়? যখনই তীব্র মনখারাপে ভুগি, কেন তুলে নিই না তোমার গানের বইখানি। এ পরবাসে রবে কে হায়! কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে... তুমি থাকতে এ আমার পরবাস নয় কবি, তুমি আমার আপনার ঘরখানি। নিশিদিন মোর পরানে প্রিয়তম মম কত-না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে। এ বারতা জীবনের, জীবনোত্তীর্ণ জীবনের, মরণের হরষে, উথলি উঠে বাণী। আমার শুধু একটি মুঠি ধরি দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী... হল না সারা কত-না যুগ ধরি কেবলই আমি লব।

এই নেওয়া একজীবনে শেষ হওয়ার নয়। এ জীবনে বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছি আমি। তাঁর গানের কাছে। আমি জানি চিরদিন এ ফেরা সম্ভব হবে না, সেদিন অন্তর্জলিযাত্রার মতো আমার কানে আমার হৃদয় থেকেই বেজে উঠবে : কে বলে 'যাও যাও'... আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া। টুটবে আগল বারে বারে তোমার দ্বারে, লাগবে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া

পত্রিকার

শুভ কামনায়

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

'আ চল্ কে তুঝে...

স ম্রা জ্ঞী ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

লিখতে বসলেই খালি ইদানিং একগাদা ছোটবেলার কথা ভিড় করে আসে, আর তাই খুব ভয় করে, তা হলে কি সত্যি-ই বড় হয়ে গেলাম? ওই তাদের মত বড়? যাদের খালি খালি মনে হয় এই জীবনটার থেকে ওই জীবনটা বেশী ভাল ছিল। এই 'ওই' জীবনটা যে কোন জীবন, তখন বুঝতাম না। এখনো যে বুঝি তা ঠিক, তবে হ্যাঁ, এটুকু বুঝি, যে কারুর কারুর জন্য 'ওই' টা একটা ফেলে আসা অতীত আর কারুর জন্য 'ওই' টা একটা অজানা, স্বপ্নালু ভবিষ্যত।

আমার ইদানিং ভবিষ্যত এর কথা ভাবলে ভয় করে, কী করতে চাই, কোথায় পৌঁছতে চাই, কিছুই প্রায় বুঝি না, আর প্রতিদিন একটু একটু করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাই। সেই ছোটবেলায় পেন্সিল বক্স ডেস্ক থেকে ধরাম করে মাটিতে পড়ে যেত মাঝে মাঝে, ব্যস! পেন্সিল, রবার, কল, স্কেল, কাটা পেন্সিলের টুকরো সব একেবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একশেষ। কোনখান থেকে যে শুরু করব, আর কোথায় গিয়ে থামব, আদপেও সব খুঁজে পাব কিনা, তার মধ্যে আবার মিস এসে পড়ায় 'টাইম আপ' হয়ে যাবে কিনা... এইসব ভাবতে ভাবতে একেবারে হুলুস্থুলু কাণ্ড হত মনের মধ্যে।

এখন আমার অবস্থাটা ঠিক সেইরকম। আর তাই আমি ভাবি না বিশেষ। বরং সারাদিন শুয়ে বসে, কলেজের ক্লাসে পড়া শুনতে শুনতে, নোটস লিখতে লিখতে, বাসে যেতে যেতে, বাইরের ঘরে ছাত্র ছাত্রী পড়াতে পড়াতে, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে শুধু ছোটবেলার কথা ভাবি।

আমার ছোটবেলা মানেই, এই ভবানীপুরের বাড়ি পুরনো দিনের বড় বড় ঘর, আর তাতে আট দশটা করে জানলা। জানলার বাইরে ছোট্ট উঠোন, তাতে একটা এমনি এমনি ছাত, সেখানে বেড়ালরা খেলা করে। হুলো বেড়ালরা বাচ্চা বেড়াল খেতে এলে, মা বেড়ালদের সাথে ঝগড়া হয়, আমার সেই আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। যে ঘুমটা কিনা মা অনেক কষ্ট করে, একগাদা গল্প বলে (তাও আবার বানিয়ে বানিয়ে, বই দেখে বললেই আমি বায়না করে প্রতিবাদ জানাতাম), মাথায় হাত বুলিয়ে, কোনোক্রমে এনেছিল, সেই মহামূল্যবান ঘুম! কে জানে সত্যি ভাঙে কিনা, নাকি আমার এখন এমনি এমনিই মনে হচ্ছে! কে জানে। এরকম কত ঘুম যে লুকিয়ে আছে আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে। বাড়ির মাঝখানে আরেকটা উঠোন আছে, সেটায় একটা পাতাবাহারি গাছ আছে, আর উঠোনের দুধারে গাছের টব রাখবার বাঁধানো জায়গা। কিন্তু সেগুলো ভেঙে গেছে কবেই, আর সেই ভেঙে যাওয়াটাই যেন নিয়ম হয়ে গেছে, অভ্যেস হয়ে গেছে।

ওই ঘুম, ওই টব রাখবার বাঁধানো জায়গার মত করে আরো কত কিছু ভেঙে গেছে। কালিপুজোর রাত্তিরে, মা ওপরে চলে যেত মেজদিদাদের সাথে ভোগ রান্না করতে, আর আমাকে মা ছাড়া শুয়ে থাকতে হত, ফুঁপিয়ে কান্না পেত আমার, আর তারপর ভোর রাত্তিরে বলি দেখতে উঠতাম। নাহ্। পাঁঠা বলি নয়, আঁখ, লাউ এইসব বলি হত। জনার্দন জ্যেঠু আমাদের পুরোহিত, মন্ত্র বলে বলে খুব ভয়াবহ মুখ করে সেইসব কাটতেন। তারপর সেই খাঁড়া ধোয়া জল তুলে রাখা হত বোতলে।

জানি বড্ড অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, আসলে কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ আমার নেই।

জনার্দন জেঠু মারা গেছেন। আমাদের বাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে গেছে, আমি বড় হয়ে গেছি, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে তবু এই বাড়ির আনাচে কানাচে এখনও খুঁজলে কিছু ঘুম পেয়ে যাওয়া যাবে। হয়ত সেই গল্প শোনা দুপুরের মত নরম নয়, হয়ত কালিপুজোর রাত্তিরের মত ফোঁপানো কান্নার নয়, তবু কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া, গুমরে ওঠা, পাশবালিশ জড়ানো, মাকে আলতো ছুঁয়ে থাকা কিছু ঘুম। আর সেই ঘুমের ভরসাতেই প্রত্যেকদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠি। কলেজ থেকে ফিরে, তারপর পড়িয়ে, রাত্তিরে যখন পড়ার ঘরটাতে ঢুকি, একটা অগোছালো, নোংরা ঘর, বই পত্তরের সাথে পড়ে থাকা ওড়না, একগাদা টুকরো কাগজ, পুরনো টেপ রেকর্ডার, কিছু রং তুলি, একটা ছোট রেডিও এই সব কিছু ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে ফিরে বেড়াতে হয়। কিন্তু কী শান্তি লাগে তখন। আসলে ওই অগোছালো, নোংরা ঘরটাতে নিজস্ব একটা সুর ভেসে বেড়ায়, যে সুরটা মন খারাপের হলেও আমার নিজের। যে সুরটা চুনকাম করা দেওয়ালের ভিতর থেকে বাজে, আর বাজে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির গায়ে।

অনেকদিন অবধি আমার ধারণা ছিল, সব বাড়িতেই বুঝি এরকম একটা সুর ভেসে বেড়ায়, সব বাড়িতেই বুঝি সকালে, দুপুরে, রাতে, খালি খালি সেতার বেজে ওঠে। আর সব বাবারাই বুঝি মিছিলে হাঁটে। এখনও যে তেমনটা মনে হয় না, তা নয়, তবে হ্যাঁ; এটুকু বুঝি যে সব বাড়িতে সুর ভেসে বেড়ালেও সব কাকারা সেতার বাজায় না, আর সব্বার স্মৃতিতেই কিছু মিছিলের ছবি থাকলেও সব মিছিলেই সব্বার বাবা হাঁটে না! আবার হাঁটেও কি না...?

জানি বড্ড খাপছাড়া লাগছে সবকিছু, আসলে আমার ছোটবেলা, আমার এই ভবানীপুরের বাড়ি, আমার বড় হওয়া, সবকিছুই খুব খাপছাড়া, এলোমেলো, ছটফটে। তাই লিখতে গেলেই বুঝতে পারি, হচ্ছে না, এবারেও হচ্ছে না, সব সেই অগোছালো, ছেঁড়া ছেঁড়া ডাইরির পাতার মত, এধার সেধার

থেকে উড়ে এসে জড় হচ্ছে খালি, আর আমি অপারগের মত, সবকিছু কুড়িয়ে নিচ্ছি... কোথাও কোনও আশ্চর্য হওয়াও নেই ...তাহলে? কী পড়ে রইল হাতে? — নিস্পৃহতা?

"তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর / মুক্তি আমার বন্ধন ডোর"

এই লাইনটা মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে আমার কাছে, খেয়াল করে দেখেছি, জীবনের কোনও সাফল্যই সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না, কোনও একদিকের তৃপ্তি অন্য অনেক অতৃপ্তি-কে জন্ম দেয় খুব তেষ্টার সময় আইসক্রীম দেখলে খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আইস ক্রীম খেলেই তেষ্টা আরো বেড়ে যায়, তারপর হয়ত-বা কোল্ড ড্রিঙ্ক, কিন্তু তারপরেও জলের প্রয়োজন হয়, আর সেই জলের খোঁজ পাওয়া যায় নিজের কোনও বাড়িতে না হয় রাস্তার ধারার কোনও ভিজে কাপড় ফেলা মিষ্টির দোকানে। রাস্তার কুকুররা যেভাবে বালির মধ্যে জায়গা করে ভীষণ গরমে ঢুকে বসে থাকে, সেভাবে মিষ্টির দোকানের ওই ভিজে কাপড়ের মধ্যে আমাদেরও ইচ্ছে করে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকতে, নিজেকে মুড়ে নিতে। কিন্তু সামাজিক হওয়ার অনেক শর্তর মধ্যে একটা শর্তই হল ইচ্ছেকে দমন করা, যা ইচ্ছে করছে ঠিক তার উলটো কোনও কাজ করা, এবং ভাবা যে 'এটাই বেঁচে থাকা, এটাই ভাল থাকা...' কে যে ঠিক করে দিল!

মিষ্টির দোকান থেকে কেন জানি মামারবাড়ির কথা মনে পড়ছে। খুব ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে বাসে করে মামারবাড়ি যেতাম, একটু বড় হওয়ার পর থেকে মেট্রো। মেট্রো হওয়ার পর মনে হত যেন মামারবাড়িটা কত কাছে চলে এসেছে। দমদমে নেমে একটা সাইকেল রিকশায় চেপে আমি মা দিদি (বাবাও যেত মাঝে মাঝে কিন্তু অফিস থেকে) সোজা জামরুল তলায়। কিন্তু আমি আজ অবধি কোনোদিন সেখানে কোনো জামরুল গাছ দেখিনি, সে যাই হোক, নেমেই প্রথম কাজ ছিল সামনের 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ ঢুকে গোপালের জন্য মিষ্টি নেওয়া। মামারবাড়িতে 'গোপাল'কে না দিয়ে কিচ্ছু খাওয়া হয় না। একবার তো অতনু দাদা রেগে গিয়ে বলেই ফেলেছিল "গোপালের এঁটো খাব না"... কিন্তু বললেই তো আর হবে না, এটা আমাদের মামারবাড়ির নিয়ম, গোপালের এঁটো ছাড়া কিচ্ছু খাওয়া যাবে না, সত্যি বলতে, আমার অন্য ঠাকুরদের প্রতি তেমন কোনও মায়া না থাকলেও 'গোপাল' এর প্রতি ছিল। কেমন ছোট্ট একটা ছেলে আজীবন ছবির মধ্যে বসে থাকে, আর দিদু তাকে সবচাইতে বেশী ভালবাসে। গোপাল সব খায়, মিষ্টি, সিঙারা, ছাতুপুরি, দই, স-অ-অ-অ-ব।

মামার বাড়িতে যখন থাকতাম, সেই দিনগুলোর মজাই আলাদা। বিশেষত ভাইফোঁটার দিন। সমস্ত মামা মাইমা, মাসি মেশো, দাদা দিদি ... একসাথে। সকাল থেকে হইহই। দিদি আর অতনু দাদা মাঝে মাঝে ছাতে 'দুর্গাপুজো দুর্গাপুজো' খেলত আর মাঝে মাঝে 'টোয়েন্টি থাউসেন্ড লীগস আণ্ডার দা সী' দুটো খেলাতেই প্রথমে আমাকে নেওয়া হত না, পরে যখন দেখত যে সিংহ বা অক্টপাসের ভূমিকায় অভিনয় করার মত কেউ নেই, তখন আমার ডাক পড়ত, আমিও নির্লজ্জের মত আত্মসম্মান বোধ ত্যাগ করে খেলতে চলে যেতাম। তারপর ঠিক পাশের বাগানেই, আমগাছ, কলাগাছ ছিল। দিদি আর অতনু দাদা লোহার 'এস' ছুঁড়ে আম পাড়ত, একজন নীচে দাঁড়িয়ে থাকত কুড়োনোর জন্য, আমি নিছক দর্শক। পিঙ্কু দাদা পিছনের ডোবা থেকে ব্যাঙাচি ধরত... আর সন্ধেবেলা মাঝে মাঝে লোডসেডিং হয়ে গেলে জানলার বাইরে এত্ত জোনাকি জ্বলজ্বল করত। সন্ধের দিকের অবশ্য মূল আকর্ষণ ছিল গান। মামার বাড়িতে সব্বাই গান জানে, মা, মামা, মাসিরা সব্বাই হারমোনিয়াম নিয়ে বসে যেত। দাদু দিদুও। দিদু সবসময় সময় পেত না। তারপর একের পর এক গান, সে যেন থামতেই চায় না। মাসিমণি গাইত বিশেষত সন্ধ্যার গান, মেজমামা হেমন্ত আর মা আরতির, বড় মামা বড় মাসি আর ছোটমামা বেশী কার গান গাইত মনে নেই, কিন্তু দারুণ গাইত। সান্তনু দাদা চিরকাল একটাই গান গাইত "মেটিরিয়া মেডিকার কাব্য" আর মেজ মাসি মূলত দুটো "ক্লান্তি যদি নামে ক্লান্ত চরণ থেমে যায়", "আহা নাম হারা কোন ফোটা ফুল"... পরে অবশ্য "ক্লান্তি যদি নামে" গানটা অনেকবার দিদিকে গাইতে শুনেছি, মায়ের কাছ থেকে শিখে। সেই অনেক ছোটবেলায় শোনা গানগুলো পরে কিন্তু খুব কাজে এসছে... "জীবন যদি ব্যথায়/ ভেঙ্গে পড়ে যেতে চায়/দিও গান/দিও প্রাণ/দিও সুর/চেতনা দিও গো আমায়।"

মায়ের কোলে সবসময় একটা হাঁড়ি বা ডেকচি থাকত, মা সেটায় তবলা বাজাত, অনেক বছর হল, মা হাঁড়ি, ডেকচি, তানপুড়া কোনোটাই বাজায় না। ঘরের কোণে ধুলো জমে, একটা তানপুরা পড়ে থাকে, যার একটা তার ছেঁড়া...

ছোটবেলার সেইসব সুরগুলোও অনেকটা ছিঁড়ে গিয়েছে, তাও মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসে বড় মামা গাইছে "ওই উজ্জ্বল দিন বাজে স্বপনেরো বীন"... মনে পড়েছে। বড় মামা বেশী সুবীর সেন গাইত বোধহয়...

দিদু, দাদুকেও গান গাইতে শুনেছি।

একবার হল কি, কোনও এক গরমের ছুটিতে মা আমাকে মামারবাড়ি রেখে এসছে, আর আমি তো হুরুদ্দুম করতে গিয়ে ছাতের সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে চিতপটাং, দিদু আমায় কত সান্ত্বনা দিচ্ছে, আর দাদু ওদিকে মাকে ফোন করে বলছে... "এই মেয়েকে আর একদিন ও রাখা যাবে না, এত দুরন্ত, তুমি নিয়ে যাও।"

আর আমি মনে মনে ভাবছি, দাদু কিনা এভাবে বলছে? এখন বুঝি, আমার মত কারুর দায়িত্ব কারুর কাঁধে চাপলে সত্যি-ই কতটা দুশ্চিন্তায় সময় কাটে। (নিজেই হাঁপিয়ে উঠি নিজেকে নিয়ে)। বিকেলেই মা আর দিদি চলে এল, দিদির হাতে একটা ইয়াব্বড় পুতুল। যাই হোক ছোটবেলায় এরকম মাঝে মাঝেই হয়ে থাকত, একবার বাড়িতে (মানে নিজের

বাড়িতে) ভীষণ জ্বর, তার মধ্যে হঠাৎ বায়না জুড়লাম হাতে 'লোহা' পড়ব। মা তো কিছুতেই রাজী নয়, তার ওপর জ্বর, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, পরে বাবা গিয়ে সেই নিয়ে এল, একটা বড় লোহা, কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য খোলা পড়া করতে করতে ওটা হারিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি একটু নটরিয়াস বাচ্চা ছিলাম, যাকে নিয়ে প্রায় সব্বাই হাল ছাড়তে বসেছিল আর কি! সে যাই হোক, কোথায় বেশ ছিলাম? হ্যাঁ, গান! এই কিছুদিন আগে দিদির বাসর রাত্তিরেও কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, যে আমরা কম যাই না। এমনকী দিদির বিয়ের পর মাসির বাড়ির গেট টুগেদারেও আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে আমরা পরের প্রজন্মরাও আসর জমাতে পারি, জোনাকি ছাড়াই, হাঁড়ি ছাড়াই! গুল্টাই দাদা আর দিদি একটা ডুয়েট গাইল, বোধয় "আজিব দাস্তা হে ইয়ে, কাঁহা শুরু কাঁহা খতম"...

সত্যিই জানি না, লেখাটা কোথায় শুরু হয়ে কোথায় যাচ্ছে, স্রেফ লেখার আনন্দে লিখে যাচ্ছি, জানি উচিত হচ্ছে না, তবু... লোভ!

আসলে এই পড়ার ঘরে ঢুকে কিছু করতে গেলেই এত কথা মাথায় আসে, হয়ত উচিত ছিল অন্য ঘরে গিয়ে লেখা, তাহলে একটু কম কথা মনে পড়ত কি? কে জানে!

আরো একটা গল্প মনে পড়ছে, তখন আমি ক্লাস থ্রী। দিদুর কাছে সুখু দুখু, পুন্যিপুকুরের পুজো, জাতকের গল্প ইত্যাদির সাথে সাথে পুতুল বিয়েরও গল্প শুনেছি, আর তাই আমার মাথায় তখন চেপে বসেছে, আমার পুতুলেরও একটা বিয়ে না দিলে চলছে না। স্কুলে গিয়ে খালি খোঁজ নিচ্ছি, কেউ আমার পুতুলের সাথে তার পুতুলের বিয়ে দেবে কিনা (প্রায় প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ের মা রা যেভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আর কি), একজনের সাথে ঠিক ও হল, কথা হল, স্কুলে তাহলে মুড়কি, লজেন্স ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে ফিস্ট করে বিয়েটা দিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু তার তো দেখি কথার খুব খেলাপ, সে আর কথাই তোলে না। তখন অবশেষে আমার আরেক বন্ধু উজ্জয়ীনির সাথে আমার পুতুলের বিয়ে ঠিক হল। আর সেটা কিন্তু মুড়কি বা লজেন্সেই মিটল না, সোজা কাকু কাকিমা এলেন আমাদের বাড়ি, ওর ছেলে পুতুলের সাথে আমার মেয়ে পুতুলের বিয়ে হল, আমার ক্যারাম বোর্ডে করে সাত পাক ঘোরা হল, তবে গিয়ে বিয়ে সম্পূর্ণ হল। আমার পুতুলের বিয়েতে দিদি খুব খেটেছিল, আর সেই জন্যই বোধহয় ও নিজের বিয়েতে আমাকে দিয়ে খুব খাটাল। যাই হোক, এরপর হল পুতুলের বউভাত। সে আরো এলাহি কাণ্ড। উজ্জয়িনীর আত্মীয় স্বজন, সব্বাই এল ওদের বাড়ি, আমরাও গেলাম, কাকিমা আবার মেয়ের খাট আলমারি সব বানিয়েছিল (আমি আসলে আমার মেয়েকে কিছু দিয়েই পাঠাইনি, হয়ত পণপ্রথার বিরোধিতা করেছিলাম, জানি না) কিন্তু, অষ্টমঙ্গলা অবধি অপেক্ষা না করে, সেদিন-ই আমি নিয়ে চলে এলাম, মেয়ে জামাইকে, এবং সেই থেকে আজ অবধি সে ঘরজামাই! আমাদের উঠোনের কোনের ঘরটাতে এখনও বোধহয় পড়ে আছে ভীষণ অযত্নে। ঠিক যেরকম অযত্নে পড়ে আছে আমার আর দিদির সাইকেল, যার চুপসে যাওয়া চাকায়, জং ধরে যাওয়া বেলে লেগে আছে আমার আর দিদির ভোর পাঁচটায় উঠে সাইকেল শেখার স্মৃতি... "এই ধর ধর ধর... এই-ই-ই-ই-ই...এই-ই... পড়ে গেলাম... পড়ে যাচ্ছি-ই-ই-ই..."

পড়ে যাচ্ছি রে দিদি... ধরবি না?

এই পড়ার ঘরটার সাথে অবশ্য অন্য অনেক গান জড়িয়ে আছে, সুমন, অঞ্জন দত্ত, মহীনের ঘোড়াগুলি, চন্দ্রবিন্দু...

"দুপুরের খামোখা খেয়াল, ভাঙা ছাত পুরনো দেওয়াল" এইসব গান তো আসলে আমি চিরকাল-ই ভেবেছি আমার জন্যই লেখা... এই ঘরটার প্রত্যেকটা দেওয়ালের প্রত্যেকটা ইঁটে আমার বড় হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলো জমা হয়ে আছে, আর সঙ্গে আছে অনেক অনেক দলা পাকানো গান, একটার পিঠে আরেকটা।... ধাঁধার থেকেও জটিল তুমি, খিদের থেকেও স্পষ্ট... হয়ত অন্য কোনও ইঁট তখন গেয়ে ওঠে "আমার আসল চেহারা কি চিনতে তুমি পার? চিনতে যদি পেরেই থাক ঘেন্না কর ঘেন্না কর"

কে জানে কত ঘেন্না, কত অভিমান, কত রাগ, কত দুঃখ নিয়ে মাঝে মাঝে বাড়িটার আশপাশ থেকে ভেসে আসে "এক আকাশ ভর্তি অভিমান / কোনওদিন গাইব না যে গান"

কিংবা মাঝে মাঝে আবার ভীষণ উল্লাসে... "হতে পারে এটা অভিনয়, তবু এইটুকু মন্দ নয়"

তাই পাগল হয়ে যখন রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ি, মনে হয় একটু শান্তি... একটু! তখনও কে জানি গেয়ে ওঠে... "এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু, পালাতে চাই যত সে আসে আমার পিছু পিছু"... আর তখন মেনে নিতেই হয়...

"হয়ত জীবন তোমায় নিয়ে খেলতে জানে"

জানি আপনারা রেগে যাচ্ছেন, ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছেন। এই সমস্ত অহেতুক প্রলাপ কে, জানি এলোমেলো এই এত শব্দে আপনাদের সময় নষ্ট হচ্ছে... কিন্তু, কী করবেন বলুন... "সে অবুঝ খেয়ালি সে ভীষণ একাকী" আর তাই সে খালি বলে যেতে চায়, লিখে যেতে চায় তার ছোটবেলার কথা, যাতে ছোটবেলার এই অসংখ্য কথার মধ্যে চাপা পড়ে যায় তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া এই সময়টা, যাতে চোখ বন্ধ করলেই সে শুধু শুনতে পায় দিদু বলছে "চুমকি রাণী এসেছ? এস", যাতে খালি দেখতে পায় দিদু তাকে তেল মাখিয়ে চান করিয়ে দিচ্ছে, মা তাকে গল্প বলে ঘুম পাড়াচ্ছে দুপুরবেলা, বাবা জ্বরের মধ্যে হাতে পড়বার লোহা এনে দিচ্ছে, মা ঘরে বন্ধ করে দিলে দিদি তাকে জানলা দিয়ে পুতুল দিয়ে দিচ্ছে, ঠাম্মা তার সঙ্গে প্লাস্টিকওলা সাজছে, দাদু কুলের আচার নিয়ে আসছে, আর রোজ সে স্কুলে গিয়ে ক্লাস হারিয়ে ফেলছে,

আর রোজ তার কান্না পাচ্ছে, যে কান্না বাড়ি এলেই থেমে যায়... সেই বাড়ি, এই বাড়ি... যেখানে ঠাম্মা নেই, দিদু দাদুর গল্প নেই, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, শুধু মা বাবা আর সে... আর তার একগাদা এলোমেলো বড় হওয়া!

ছোটবেলা সব্বার থাকে, কিন্তু বড় বেলা? তাও থাকে বোধহয়, কিন্তু বড় বেলায় কী করে মানুষ? ছোটবেলার স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকে? কে জানে! আমি শুধু অপেক্ষা করি প্রতিদিন কবে আমার আজটুকু জুড়ে যাবে আমার ছোটবেলায়, আর কবে আমি আমার আজকের কথাগুলোও শুয়ে শুয়ে নিরিবিলিতে, গরমের দুপুরে পাখা চালিয়ে, পাশবালিশ জড়িয়ে ভাবতে পারব... কবে আমার আজকের কথা ভাবতে আর ভয় করবে না...

"এখনও ভাবে সে ফুটবে পলাশ, ডাকবে কোকিল, বিছানায় সে ফিরবে পাশ"

উজ্জয়িনী ভুবনেশ্বরে, শ্রীতমা, প্রিয়া, প্রিয়াঙ্কা ব্যাস্ত, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দাদা দিদিরা চাকুরিজীবি, বিবাহিত, তাদের অন্য দায়িত্ব, আমি তাই নিজের মত করে খুঁজে নিচ্ছি নিজের কিছু কাজ। সারা সপ্তাহ পড়াই, সময় পেলে পেন স্টাণ্ড, ব্যাগ ইত্যাদি বানাই প্রিয় মানুষদের জন্য, আর দিনের শেষে শুধু ভাবি, ভাগ্যিস এই বাড়িটা ছিল। মা বাবার সাথে সাথে আরো একটা কেউ, যে নিশ্চুপে বুঝে যায়, আমার মন ভাল না মনখারাপ, যে কোনওদিন আমায় কিচ্ছু জিজ্ঞেস করে না কিন্তু জেনে যায় আমার সমস্ত অস্থিরতা, যে তার নিজের রঙ উঠে যাওয়া, দুর্বল হয়ে পড়া, ফাটল ধরে যাওয়া শরীরটা নিয়ে আমার "আরো বেদনা আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা"

আর সেই আমার কোনো কালবৈশাখী ঝড়ের দিন, প্রবল বৃষ্টির দিন সমস্ত শরীর মেলে দিয়ে আমার সঙ্গে গেয়ে ওঠে ..."আরো প্রেমে আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে"...

আর যার কাছে আমই প্রতিনিয়ত জানতে চাই...

"কি হবে গতি বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে?"

আর তখন-ই সমস্ত বাড়ির ইঁটে ইঁটে বেজে ওঠে কাকার সেতার... ছোটবেলার গান, আমাদের বাড়ির সামনের লুকোচুরি, কুমিরডাঙা, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, দিদির সাথে ঝগড়া...

"সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার পরে, অঙ্গ বিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে"

রাত্তিরে মা বাবার সাথে খেতে বসি যখন, বাবা সারাদিনের গল্প বলে, মায়ের খানিক ঘুম পেয়ে যায়, আর আমি কোনোদিন অনেক কথা বলি, কোনদিন চুপ... দিদির ফোন আসে... বন্ধুরা মেসেজ করে, আমার ভীষণ ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে, ঘুম হয় না... খাটে শুয়ে ছটফট করি আর মনে মনে হাত জোর করে এই বাড়িটার ইঁটগুলোর কাছে জানাই ...

"ক্লান্তি যদি নামে,
ক্লান্ত চরণ থেমে যায়
ও গো সাথী, আশার বাতি
জ্বেলে দিও এ হৃদয়"

পত্রিকার

শুভ কামনায়

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

শ্রীচরণকমলেষু [শ্রীচরণকমলেষু বিভাগে প্রতিসংখ্যায় আমাদের কোনো এক প্রণম্য এবং প্রিয় কবির যেকোনো একটি প্রিয়কবিতার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করবো। এই সংখ্যা কবি শঙ্খ ঘোষের 'শূন্যের ভিতরে ঢেউ' কবিতাটি আলোচিত হলো। লেখা : দেবব্রত কর বিশ্বাস]

এই মহাশূন্যে...

সময়ের পাঁজর থেকে পাপড়ি খসে পড়ছে। এক নিরাকার শরীর নিয়ে আমাদের ভাষাবৈকল্যের যবনিকাপাত রচনা করতে উদ্যত হয়েছেন স্বয়ং মানবপ্রকৃতি। এই সদাহাস্যময় প্রহেলিকায় দিনেদিনে নিঃস্ব হয়ে আসা নাগরিক সমাজচিত্রে নিরাময় লিখে রাখা কিছু ধ্বনি, শব্দ, ছন্দ, সুর নিয়ে আমাদের আকণ্ঠ বসবাস। সময়োচিত অবয়বহীন প্রেমের চিকন আভাস যখন বুকের ভিতরের সমস্ত মোরগঝুঁটিকে শূন্যতায় ভাসিয়ে দেয় কিছু আদিম অপরিণামদর্শীতায় ঠিক সেই হিমেল হাওয়া এবং নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসার মুহূর্তে নম্র আরোগ্য সূচিত হয় কবিতার পাঁজরতলে। ভাষাহীন সমাজ-পরিপাকে আমাদের দিশাহীন রূপলাবণ্যময় জয় উল্লাসে প্রকৃত উচ্চারণের ইন্ধন জুগিয়েছেন কবি শঙ্খ ঘোষ — 'বলিনি কখনো? / আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে। / এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে / সেই এক বলা / কেননা নীরব এই শরীরের চেয়ে আরো বড়ো কোনো ভাষা নেই...।' এমনই এক নব্যকল্য সামাজিক কাঠামোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আমাদের ব্যক্তিরুচি যে সেখানে তারল্যের লাস্যে এবং কতিপয় শব্দনিনাদে নির্মিত হতে থাকে হৃদয়ের অভিজ্ঞানপর্ব। তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠা আঙ্গিকের পাত্রে চুমুক মেরে আমরা শিখে নিতে চাই ফলিত গণিতের শরীরসূত্র। আর এখানেই আমাদের যাবতীয় জ্যামিতিক দর্শন ভেসে যায় শঙ্খ ঘোষের কবিতায় গড়ে ওঠা অনিবার্য দৃশ্যকল্পে — 'কেননা শরীর তার দেহহীন উত্থানে জেগে / যতদূর মুছে নিতে জানে / দীর্ঘ চরাচর / তার চেয়ে আর কোনো দীর্ঘতর যবনিকা নেই।' যেন খুব দূর থেকে ভেসে আসা একটা নরম সুর। হয়তো বেহাগ। কিংবা শ্যামকল্যাণ। সেই সুরের অনুগামী হয়ে বাইরের আকাশ তখন অঝোরে পতনশীল আর শব্দের অনুপুঙ্খতায় কোষস্থিত নিউক্লিয়াস অবধি কেঁপে ওঠে মগ্ন অভিনিবেশে। পাপসিদ্ধ শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেগে ওঠে ত্রাণহীন কালিমায় মিশে থাকা প্রাকৃতিক উষ্ণতায় সিক্ত উদ্দাম লবণের অভিলিপ্সা। শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়তে পড়তে এমনই সব অপার্থিব মোমদানে আলোকিত হয়ে ওঠে আমাদের চেতনা উৎসব। বিশেষত পাঠকের কাব্যবোধ আক্রান্ত হয় মহাশূন্যের ব্রহ্মরহস্যে। যেন চিরকালীন মেঘমেদুর হয়ে থাকা জাগতিক মৃত্যুসংকলন। শেষ যাত্রাপথের আশ্রয় কোথায় পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে অবশ্য কোনো বিরোধ থাকা উচিত নয় দীর্ঘ বস্তুচিন্তায়। যার কোনো সমাধান নেই তাকে ঘিরে উদ্বেল হয়ে ওঠার মতো ফ্যান্টাসি আমাদের সমসময় গ্রাহ্য করে না। তবু সবাইকে থমকে দাঁড়াতেই হয় সেই চিরস্থায়ী মানসিক অবসাদে বিধৃত এক কাব্যবোধের কাছে যেখানে পড়ন্ত ফুল, চিতার রূপালি ছাই, ধাবমান শেষ ট্রাম অবধি আশ্রয় খুঁজে চলেছে দিনের পর দিন। এই কি তবে সেই চিরন্তন যাত্রাপথের ধারাবিবরণী যেখানে মানব জীবনের সমগ্র শাশ্বত আশা দুহাত বাড়িয়ে কাছে ডাকছে, আর, এই পোড়া পৃথিবীর কবিতারা একই সঙ্গে একমুখী এবং বহুগামী হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সোঁদা মৃত্তিকার নাভিগন্ধমূলে। এইসব উপলব্ধি হয় আজকাল শঙ্খ ঘোষের 'শূন্যের ভিতরে ঢেউ' কবিতাটি পড়ে। চিরাচরিত কাব্যপ্রণালীতে যখন মিশে যেতে থাকে সামগ্রিক গণিতলব্ধ ভণিতা তখন এই মহান কবির কাছে আশ্রয় না নিয়ে অন্য কোনো উপায় থাকে না। আমরা যারা প্রতিনিয়ত তত্ত্বের উপনিবেশে একা হয়ে যাচ্ছি আর আমাদের নিরুত্তর অসহায়তা কোনোদিন অবচেতনকেও বোবা করে দিতে পারে বলে শঙ্কিত হচ্ছি ঠিক তখনই বিশ্লেষণে উত্তির্ন হলাম — 'সেকথা বলিনি? তবে কীভাবে অকাল এতদিন / জলের কিনারে নিচু জবা?' — স্তম্ভিত এবং জলমগ্ন হয়ে পড়ি। এই স্তবকের মানে কী? কোন্ কথা বলা হয়নি? কেনই বা জলের কিনারে নিচু জবা তাকিয়ে থাকলো, এর কোনো সরলরৈখিক উত্তর খুঁজে না পাবার মগ্নতায় দৃশ্যত নিজেকে ভীষণ শূন্য মনে হয়। প্রত্যুত্তরে শঙ্খ ঘোষ লিখে রেখেছেন — 'শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতরে এক ঢেউ আছে / সেকথা জানো না?' — আর কিছু বলার থাকে না এর পরে। ঢেউ আসে। ঢেউ যায়। শূন্যতা ক্রমশই জারিত হতে থাকে এই মহাশূণ্যে। অসহায় লাগে। দাবদাহময় খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আজো মনে হয় হঠাৎ কিছু উটকো কালবৈশাখী এবং শঙ্খ ঘোষের কবিতার বই, বেঁচে থাকার জন্য এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়?

মুদ্রণ মডার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯৮৩০২-৩৩৯৫৫
ডি.টি.পি. ইমেজ, ৯৮৩০৮-২৪৮৭২
প্রকাশক বিশ্বব্রত আচার্য্য
সম্পাদকীয় যোগাযোগ প্রযত্নে রতন বিশ্বাস, বেনেপুকুর, গোবিন্দপুর (এম), মহেশতলা, কলকাতা-৭০০১৪১
কথা ৯৮৩০২-২৫৬৮৭ (বিশ্বদীপ দে)
ই-যোগাযোগ debabrata20in@gmail.com / biswadipdey3@gmail.com

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বিশ্বদীপ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com